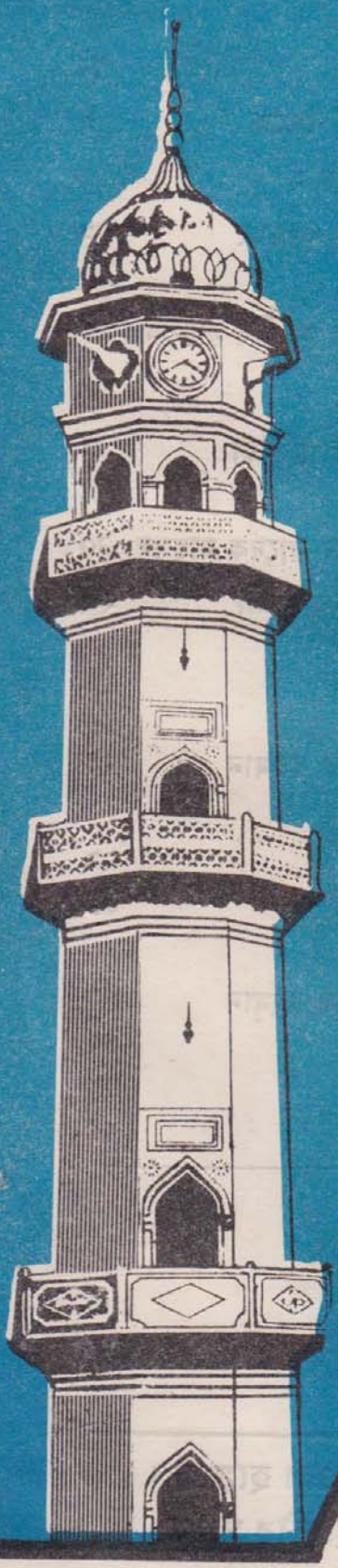

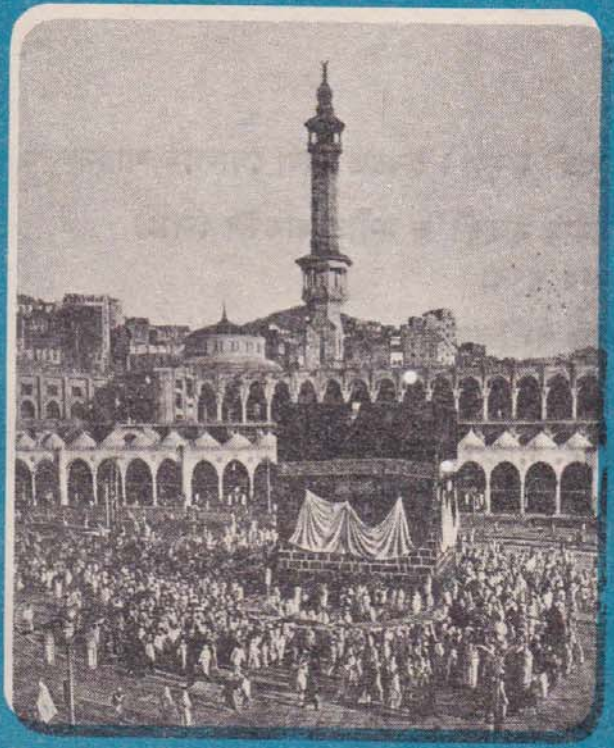

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৫৯ বর্ষ ॥ ৩য় সংখ্যা

১০ই রবিউসসানি, ১৪১৮ হিঃ ॥ ৩১শে শ্রাবণ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ ॥ ১৫ই আগষ্ট, ১৯৯৭ইং

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ১০০ টাকা ॥ ভারত ৩ পাউণ্ড ॥ অন্যান্য দেশ ২০ পাউণ্ড ॥

সূচিপত্র

বিষয়		লেখক	পৃঃ
তরজমাতুল কুরআন (তফসীর সহ)	:	'কুরআন মজীদ' থেকে	১
হাদীস শরীফ : জুমুআর গুরুত্ব	:	অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ	৩
অমৃত বাণী :	:	অনুবাদ : মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক	৫
হাকীকাতুল ওহী : মূল : হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ)	:	অনুবাদ : নাজির আহমদ ভুঁইয়া	৭
জুমুআর খুৎবা	:	অনুবাদ :	
সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' (আইঃ)		মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ	১০
চলতি দুনিয়ার হালচাল	:	মোহাম্মদ মোস্তফা আলী	২২
বুঝাতে পারলে জনগণ বুঝে ও সক্রিয় হয়			
ইনকিলাবে হাকীকী (প্রকৃত বিপ্লব)	:	অনুবাদ :	
মূল : হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী, আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ)		মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	২৪
পত্র-পত্রিকা থেকে	:		২৯
কবিতা : গোলাপ গাছের কাঁটা	:	আহমদ সেলবর্সী	৩৯
ছোটদের পাতা	:	পরিচালক : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান	৪০
সংবাদ	:		৪২
আস্হাবে কাহাফের পাতা	:	আররকীম	৪৩
সম্পাদকীয়	:		৪৫

সম্পাদনা পরিষদ

মোহতরম আহমদ তৌফিক চৌধুরী—প্রধান উপদেষ্টা
জনাব মোহাম্মদ মোস্তফা আলী —উপদেষ্টা
জনাব মকবুল আহমদ খান —সম্পাদক
জনাব মোহাম্মদ মুতিউর রহমান —সহকারী

* আপনার বর্তমান বছরের চাঁদা ১লা জুলাই থেকে পাওনা হয়েছে।

** অনুগ্রহ করে হিসাব দেখে চাঁদা দিয়ে পাক্ষিক আহমদীর সাথে সহযোগিতা করুন।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

৫৯তম বর্ষ : ৩য় সংখ্যা

১৫ই আগষ্ট, ১৯৯৭ : ১৫ই যহুর, ১৩৭৬ হিঃ শামসী : ৩১শে শ্রাবণ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ

তরজমাতুল কুরআন

সূরা আল্ নিসা—৪

১০২। এবং যখন তোমরা পৃথিবীতে সফর কর এবং আশঙ্কা কর যে, যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা তোমাদিগকে ফিত্‌নায় (৬৫৯) ফেলিয়া দিবে তখন যদি তোমরা নামায সংক্ষেপ কর তাহা হইলে ইহাতে কোন পাপ বর্তিবে না। কাফেররা নিশ্চয় তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

৬৫৯। ভয়ের সময়ে নামায আদায় করা সম্বন্ধে, কুরআনে তিন স্থানে পৃথকভাবে বলা হইয়াছে। যথা : (১) ২:২৪০ আয়াতে রীতি অনুযায়ী নামায আদায় করা যে সময়ে অতি-বিপদ ও অতি-ভীতির কারণে সম্ভব নয়; (২) বর্তমান আয়াত (৪:১০২); সাধারণ ভীতির অবস্থায় নামায সংক্ষিপ্ত করা যখন প্রয়োজন বিবেচিত হয়, এবং (৩) পরবর্তী আয়াতে (৪:১০৩)। এই আয়াতে ভীতির অবস্থায় জামাতে সংক্ষিপ্ত নামায আদায় করা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে। 'নামায সংক্ষেপ করা' কীরূপ? বর্তমান আলোচ্য আয়াতে, ব্যক্তিগত নামাযের ক্ষেত্রে, 'রাকায়াত' কমানো বুঝায় না। কেননা, ভ্রমণরত অবস্থায় চারি রাকায়াতের স্থলে, প্রথম হইতেই নামায 'দুই রাকায়াত' নির্দিষ্ট ছিল। এখানে শত্রুর আক্রমণের ভয় থাকার কারণেই ব্যক্তিকে তাড়াতাড়ি করিয়া নির্দিষ্ট নামাযটি আদায় করার অনুমতি দেওয়া হইয়াছে। "ভ্রমণরত ব্যক্তির নামায আদায় প্রথম হইতেই দুই রাকায়াতে সীমিত। তবে বিপদের সময় একাকী নামায পড়ার অবস্থায় এই দুই রাকায়াতই দ্রুতগতিতে আদায় করা বিধেয়" (কাসীর)। এই অভিমত সমর্থন করেন মুজাহিদ, দাহ্‌হাক এবং বুখারী ('সালাতুল খাওফ' অধ্যায়)। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, "প্রথমে নামায দুই রাকায়াতই ছিল, গৃহেই হউক আর ভ্রমণেই হউক। পরে গৃহবাসীর জন্য ইহা বৃদ্ধি করিয়া চারি রাকায়াত করা হইল। কিন্তু ভ্রমণাবস্থার জন্য ইহা দুই রাকায়াতই রহিয়া গেল" (বুখারী, 'সালাত' অধ্যায়)। হযরত উমর (রাঃ) বলিয়াছেন, 'ভ্রমণের অবস্থায় নামায দুই রাকায়াত, দুই

১০৩। এবং যখন তুমি নিজে তাহাদের মধ্যে থাক এবং তুমি তাহাদিগকে নামায পড়াও তখন তাহাদের মধ্যে হইতে একদল যেন তোমার সঙ্গে দাঁড়ায় এবং তাহারা যেন তাহাদের অস্ত্রে সজ্জিত থাকে। এবং যখন তাহারা সিজদা সম্পন্ন করে তখন যেন তাহারা তোমাদের পশ্চাতে (শত্রুর সম্মুখে) দণ্ডায়মান হয়; এবং অন্য দল যাহারা এখনও নামায পড়ে নাই তাহারা যেন আগাইয়া আসে এবং তোমার সঙ্গে (৬৬০) নামায আদায় করে এবং তাহারা যেন আত্মরক্ষার উপকরণ অবলম্বন করে ও অস্ত্রাদিতে সজ্জিত থাকে। (৬৬১) এবং যাহারা অস্বীকার করিয়াছে তাহারা কামনা করে যে তোমরা যদি তোমাদের অস্ত্র-শস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম হইতে অসতর্ক হও তাহা হইলে তাহারা যেন অতর্কিতে একযোগে তোমাদের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারে। এবং বৃষ্টিপাতের কারণে যদি তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও, তখন তোমাদের উপরে কোন পাপ বর্তিবে না যদি তোমরা তোমাদের অস্ত্রাদি খুলিয়া ফেল, এবং তোমরা (সদা) আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ কর। আল্লাহ্ নিশ্চয় কাফেরদের জন্য লাঞ্ছনাজনক শাস্তি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন।

ঈদের প্রতিটিতেও নামায দুই রাকায়াত, শুক্রবারের নামাযও দুই রাকায়াত। এই দুই রাকায়াত নামাযই স্বয়ং-সম্পূর্ণ; কমাইয়া দুই রাকায়াত করা হয় নাই। আমরা স্বয়ং নবী করীম (সাঃ) হইতে ইহা জানিয়াছি (মসনদ, নিসাঈ এবং মাজাহ্)। খালিদ বিন সাঈদ একবার ইবনে উমরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কুরআনের কোথায় পথিকের নামাযের কথা আছে? সেখানে তো কেবল ভীতির অবস্থায় নামায আদায় করা সম্বন্ধে বক্তব্য আছে।' ইব্নে উমর উত্তরে বলিলেন, "আমরা নবী করীম (সাঃ)-কে যেভাবে যাহা করিতে দেখিয়াছি তাহাই করিয়াছি" অর্থাৎ ভ্রমণরত অবস্থায় নবী করীম (সাঃ)-এর সাথে দুই রাকায়াতই পড়িয়াছি (জরীর, ৫ম, ১৪৪, নিসাঈ, 'সালাত' অধ্যায়)।

৬৬০। পূর্ববর্তী আয়াতে ভয় ও বিপদের অবস্থায়, ব্যক্তিগতভাবে নামায পড়িবার বিষয়ে বলা হইয়াছে। এই আয়াতে উপরোক্ত ভয়ের অবস্থায় মুসলমানেরা দলবদ্ধভাবে থাকিলে, কীভাবে জামায়াতে নামায আদায় করিবেন, তাহাই বিষদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। বিভিন্ন সময়ে, এইরূপ বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে, অবস্থাভেদে একাদশ পদ্ধতিতে জামায়াতে নামায পড়া হইয়াছে বলিয়া হাদীসে উল্লেখ রহিয়াছে।

৬৬১। এই আয়াত 'আস্লেহা' (অস্ত্রশস্ত্র) এবং হিয্র্ (পূর্ব-সতর্কতা) শব্দদ্বয়ের মধ্যে পার্থক্য করিয়াছে। তুলনামূলকভাবে নিরাপদ অবস্থায় অস্ত্র-শস্ত্র হাত হইতে রাখা যাইতে পারে, কিন্তু কোনও অবস্থাতেই সতর্কতা অবলম্বনকে অবহেলা করা যাইতে পারে না। ৪:৭২ দেখুন।

হাদিস শরীফ

অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা সালেহ আহমদ
সদর মুরব্বী

জুমুআর গুরুত্ব

কুরআন :

يايها الذين امنوا اذا نودى للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله و ذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ٥ (سورة الجمعة ايت ١٠)

অর্থাৎ : হে যারা ঈমান এনেছো ! যখন জুমুআর দিনে নামাযের জন্য আহ্বান করা হয় তখন আল্লাহ্‌র স্মরণের জন্য তাড়াতাড়ি আস এবং ক্রয়-বিক্রয় পরিত্যাগ কর। ইহাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে। (সূরা জুমুআ আয়াত : ১০)

হাদীস :-

عن سلمان الفارسى قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من اغتسل يوم الجمعة و تطهر لما لستطاع من طهر ثم دهن او مس من طيب ثم راح و لم يفرق بين اثنين فصلى ماكتب له ثم اذا خرج الامام انصت غفرله ما بينه وما بين الجمعة الا خرى (بخارى كتاب الجمعة)

অর্থাৎ সালমান ফারসী (রা:) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম (সা:) বলেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন গোসল করে এবং যতটুকু পরিষ্কার পবিত্র হতে পারে ততটুকু পরিষ্কার-পবিত্র হয়। তৈল ও সুগন্ধি লাগিয়ে মসজিদের দিকে রওয়ানা হয় এবং মসজিদে গিয়ে দু' ব্যক্তির মাঝখানে জবরদস্তি জায়গা করে বসে না এবং যতটুকু নামায তার জন্যে ফরয তা আদায় করে তাহলে ঐ ব্যক্তির এক জুমুআ হতে অন্য জুমুআ পর্যন্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হয়। (বুখারী)

ব্যাখ্যা :-

ইসলাম খোদার নৈকট্য লাভের যে পথের সন্ধান দিয়েছে তা হলো ইবাদত। ইবাদত হলো খোদার প্রেমে বিভোর হয়ে তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়া। খোদার ইবাদতই মানব জীবনের সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এজন্য বালেগ মুসলমানের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও জুমুআর নামায ফরয। জুমুআর গুরুত্ব সম্বন্ধে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উপরোক্ত আয়াতে জুমুআর গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য আল্লাহ বলেছেন, ব্যবসার মত লাভ লোকসানের

কারবার হলেও তা ছেড়ে আল্লাহর স্মরণের জন্যে উপস্থিত হয়। এই জুমুআর মধ্যে তোমাদের জন্যে অনেক কল্যাণ নিহিত রয়েছে।

হযরত রসূল করীম (সাঃ) জুমুআর গুরুত্ব এক সপ্তাহের পাপের মোচনের সোপান-স্বরূপ জুমুআকে আখ্যায়িত করেছেন। জুমুআর গুরুত্ব অনুধাবন করতঃ মানুষ যদি নিজের পাপের জন্যে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাহলে আল্লাহ তার পাপ ক্ষমা করবেন। জুমুআ একটি মাইল ফলক, যেখানে দাঁড়িয়ে মানুষ গত এক সপ্তাহের বিচার করতে পারে যে, সে কতটুকু খোদার আজ্ঞানুবর্তিতা করেছে, সে হিসাবে পরবর্তি এক সপ্তাহের জন্য সে নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য পরিকল্পনা করতে পারে। হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) বলেন, জুমুআ ইসলামে শুধু ঈদের দিনই নয় বরং ইসলামী আহকাম এর পুনরুজীবনেরও একটি দিন। এই দিনে মুসলমানদের কানে ইসলামের পবিত্র নসীহতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। বিস্তৃত মাসায়েল নতুনভাবে স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। এই দিনে মুসলমানদের উপর ফরয যে, তারা মসজিদে যাবে এবং ধর্মীয় নসীহতসমূহ শুনে নিজেদের ঈমান ও জ্ঞান বৃদ্ধি করবে। জুমুআ মুসলমানদের জন্য দু' ধরনের গোসলের দিন। এক গোসল তো দেহের গোসল যার পর পরিষ্কার কাপড়-চোপড় পরিধান করা হয়। দ্বিতীয়টি হলো হৃদয়ের গোসল অর্থাৎ তওবা ও ইস্তেগফারের পর তাকওয়ার লেবাস পরিধান করা হয়। এজন্যে জুমুআর এক বৈশিষ্ট্য হলো, যে ব্যক্তি নিষ্ঠা ও ঈমানদারীর সাথে জুমুআর নামাযে হাযির হয় হেদায়াতসমূহ শুনতে থাকে, নিজ গৃহে সত্যিকার তওবার তোহফা আনে. তাহলে তাকে অন্যান্য দিনে নিষ্ঠার নামায দান করা হয়, এবং বাতেনী (অভ্যন্তরীণ) ঐক্য-একাগ্রতাও দান করা হয় যা, জুমুআ শব্দের অর্থে নিহিত আছে। ইহা ছাড়াও এর দ্বারা মোমেন পরস্পরের সাথে পরিচিত হয় এবং একের প্রভাব অন্যের উপরে পড়ে। উত্তম নৈতিকতায় একে অপরের উত্তরাধিকারী হয়। খোদাতা'লা জুমুআর জন্যে বিশেষভাবে তাকীদ করেছেন বরং সূরার নামও জুমুআ রেখেছেন এবং হাদীসে জুমুআ পরিত্যাগকারীর জন্যে কঠোর সতর্কবাণী রয়েছে। (জুমুআর ছুটির জন্য দরখাস্ত পহেলা জানুয়ারী, ১৮৯৬)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন :

اللهم مزقهم كل ممزق و سحقهم تسحيقا

(আল্লাহুম্মা মায্যিকহুম কুল্লা মুমায্যাকিন ওয়া সাহ্হিক্হুম তাস্হীকা)

অর্থ : হে আল্লাহ্! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

অনুবাদ : আব্দুল আযীয সাদেক
সদর মুরবী

প্রকৃত বিষয় ইহাই যে, খোদা যা চান তা-ই করেন। বিরানাকে জনবসতি এবং জনবসতিকে বিরানা করে দেন। ব্যাবিলন শহরের সঙ্গে তিনি কিইনা করেছেন? যে স্থান সম্বন্ধে মানুষের পরিকল্পনা ছিল যে, উহা জনবসতিতে পরিণত হউক, উহ ঐশী অভিলাষে বিরানায় পরিণত হয়ে গেল এবং পেঁচাদের বাসস্থান হয়ে গেল। আর যে স্থানটিকে মানুষ চেয়েছিল বিরানা করতে উহা সারা জগতের লক্ষ্যস্থল হয়ে গেল। সুতরাং ভাল করে স্মরণ রেখো যে, খোদাকে ছেড়ে ঔষধ এবং তদবীরের উপর নির্ভর কর: নির্বুদ্ধিতা বৈ কিছু নহে। নিজেদের জীবনে এমন আমূল পরিবর্তন আনয়ন কর যেন এক নবজীবন অনুভূত হয়। বেশী বেশী ইস্তেগফার পড়। অধিক পার্থিব কার্যব্যস্ততার দরুন যাদের ফুরসৎ কম থাকে তাদিকে সবচাইতে বেশী ভয় করা উচিত। চাকুরিজীবী লোকদের দ্বারা সাধারণতঃ খোদাই দায়িত্ব পালন লঙ্ঘন ঘটে; এই জন্য অসুধিধা সৃষ্টি হলে যোহর ও আসর এবং মাগরেব ও এশা একত্রে জমা পড়ে নেওয়া জায়েয হয়। আমি অবশ্য ইহাও জানি যে, কর্তৃপক্ষের কাছে নামায পড়ার জন্য অনুমতি চাইলে তারা অনুমতি দিয়ে দেন। তাছাড়া উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের পক্ষ হতে অধীনস্ত কর্মকর্তাগণকে এইরূপ বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়ে থাকে। নামায ছেড়ে দেওয়ার জন্য এইরূপ অযৌক্তিক উযর বাহানা তালাশ করা অন্তরের দুর্বলতা বৈ কিছু নহে। হুক্‌কুল্লাহ (আল্লাহ্‌র জন্য দায়িত্বাবলী) এবং হুক্‌কুল ইবাদ (বান্দাদের জন্য দায়িত্বাবলী) আদায় করার ব্যাপারে শিথিলতা ও সীমালঙ্ঘন করো না (মলফুযাত ১ম খণ্ড, ২৬৫ পৃঃ)।

আল্লাহ্‌তা'লা সালেহ (পুণ্যবান) লোকদের ছাড়া অন্য কারো পরওয়া করেন না। পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও মহব্বত সৃষ্টি কর, পশুসুলভ আচরণ ও মতভেদ পরিহার করো। সব রকমের ঠাট্টা ছল-চাতুরী সম্পূর্ণ বর্জন কর, কারণ ঠাট্টা-চাতুরী মানুষের অন্তরকে সত্যতা হতে বহু দূরে নিক্ষেপ করে। পরস্পর একে অপরকে সম্মান কর তোমাদের প্রত্যেকই

যেন নিজেদের আরামের উপর নিজের ভাইয়ের আরামকে প্রাধান্য দেয়। খোদার সঙ্গে সত্যিকার সন্ধি স্থাপন করো এবং তাঁর আনুগত্যে প্রত্যাবর্তন কর। আল্লাহ্‌তা'লার ক্রোধ জমিনের উপর নেমে আসছে, উহা হতে তারাই রক্ষা পাবে যারা সম্পূর্ণরূপে নিজেদের পাপসমূহ হতে তওবা করে তাঁর আস্তানায় হাজির হয়ে যায়।

তোমরা স্মরণ রাখিও যে, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র আদেশ পালনে আত্মনিয়োগ কর এবং তাঁর দীনের সেবা-যত্নে চেষ্টাবান হও তাহলে খোদা অবশ্যই তোমাদের সকল প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করে দিবেন এবং তোমরা সফলকাম হবে। তোমরা কি লক্ষ্য কর নাই যে, কৃষক ভাল চারাগুলির খাতিরে ক্ষেতের মধ্য থেকে অকেজো গাছা-গাছালি তুলে ফেলে দেয় এবং নিজের ক্ষেত খামারকে সুন্দর বৃক্ষরাজি ও ফলদার গাছ-গাছড়া দ্বারা সুবিন্যস্ত করে তুলে, উহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করে এবং প্রত্যেক অনিষ্ট ও ক্ষয়ক্ষতি হতে ওগুলিকে রক্ষা করে। কিন্তু যে বৃক্ষে ফল ধরে না, ক্রমশঃ ওগুলি শুকাতে ও পচতে আরম্ভ করে। মালিক সেগুলির পরোয়া করে না যে, গরু-মহিষ এসে খেয়ে যাক বা কোন কাঠুরিয়া ঐগুলিকে কেটে তন্দুরে নিক্ষেপ করুক। এই রূপই তোমরা স্মরণ রেখো, তোমরা যদি খোদার দরবারে সত্যবাদী প্রমাণিত হও তাহলে কোন বিরোধিতা তোমাদের কষ্ট দিতে পারে না, কিন্তু তোমরা যদি তোমাদের অবস্থাকে দোরস্ত না কর এবং খোদাতা'লার সাথে আনুগত্যের সত্যিকার প্রতিজ্ঞা না কর তাহলে মনে রেখো খোদাতালাও কারো পরোয়া করেন না। সহস্র সহস্র মেষ বকরী প্রত্যহ যবাই করা হয়, তাদের উপর কেহ রহম করে না, কিন্তু একটি মানুষ মারা গেলে কতই না জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ হয়ে যায়। সুতরাং তোমরা যদি নিজদিগকে পশুসদৃশ বেকার উচ্ছৃঙ্খল লোকে পরিণত করে ফেল তাহলে তোমাদেরও সেই অবস্থাই হবে। অতএব তোমাদের একান্ত উচিত যেন তোমরা খোদার প্রিয় বান্দাদের অন্তর্গত হয়ে যাও, যাতে কোন মহামারী বা আপদ তোমাদের উপর আক্রমণ করতে সাহস না পায় কারণ, কোন ঘটনা আল্লাহ্‌তা'লার অনুমতি ব্যতিরেকে জমিনের উপর সংঘটিত হতে পারে না। পরস্পরের মধ্যে সব রকমের বিবাদ, উত্তেজনা ও শত্রুতাকে নিজেদের মধ্য হতে তুলে ফেলো। এখন সময় এসে গেছে যে, তোমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় হতে বিমুখ হয়ে গুরুত্বপূর্ণ মহৎ কাজে ব্রতী হও। লোক তোমাদের বিরোধিতা করবে, আঞ্জুমানের সদস্যরা তোমাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবে, তোমরা তাদেরকে নম্রভাবে বুঝাও, জোশকে আদৌ স্থান দিও না। ইহা তোমাদের জন্য আমার ওসীয়্যত। এই কথাগুলি ওসীয়্যতস্বরূপ স্মরণ রেখো; তীব্র মেযাজী ও কঠোরতার সহিত কোন কাজ করবে না বরং নম্রতা, ধীরে সুস্থে এবং উত্তম চরিত্রের মাধ্যমে সকলকে বুঝাও।

হাকীকাতুল ওহী

[মূলঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী]

ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভূঁইয়া

(২য় সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

এই অংশতো অধিক বৃষ্টিপাত সম্পর্কিত। এখন আমি ঐ অংশটি বর্ণনা করিতেছি যাহা বরফ পড়া সম্পর্কিত। একটু পূর্বেও আমি ইহা লিখিয়াছি যাহাতে বুঝা যায় যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী বিশেষভাবে এই দেশের জন্য বরং অন্যান্য দেশেও ইহা অস্বাভাবিক অবস্থা দেখাইয়াছে। তাহা এই যে :—

অমৃতসর হইতে প্রকাশিত 'উকিল' পত্রিকা ১৯০৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী মোতাবেক ১৩২৪ হিজরীর ২৩শে যিলহজ্জ সংখ্যার ২য় পৃষ্ঠায় ইউরোপের মৌসুমী অবস্থা সম্পর্কে নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়াছে :

"ইউরোপের কোন কোন দেশে এই বৎসর শীতের এইরূপ তীব্রতা বর্ণনা করা হইয়াছে যে, বিগত বৎসরগুলিতে সম্ভবতঃ ইহার কোন দৃষ্টান্তই পাওয়া যাইবে না। বস্তুতঃ বেলজিয়ামে তাপমাত্রা শূন্যেরও অধিক নীচে চলিয়া গিয়াছে। বার্লিনে ইহা হিমাঙ্কের তের ডিগ্রীর নীচে এবং অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীতে বিশ ডিগ্রীর নীচে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই প্রচণ্ড শীতে কয়েক ব্যক্তি মরিয়াও গিয়াছে। ইউরোপ মহাদেশের কোন কোন রেলওয়েতে চলাচল বিঘ্নিত হইয়াছে। কেননা, পানি জমিয়া যাওয়ার দরুন ইঞ্জিনের নল ফাটিয়া গিয়াছে। ডেনিউব ও ওডেমিয়া বন্দরে পানি জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে। রাশিয়া ও ইংল্যাণ্ডে তাপমাত্রা এতখানি নামিয়াছে যে, বিগত কয়েক বৎসরে এইরূপ অবস্থা দেখা যায় নাই। রোম ও নেপস্ সের মধ্যকার ট্রেনে এত বরফ পড়িয়াছে যে, মানুষ হায় হায় করিয়া উঠিয়াছে। কনস্ টানটিনোপলে কয়েক ফুট বরফ পড়িয়াছে। বসফোরাস প্রণালীতে জাহাজ ও ষ্টীমার চলাচল স্থগিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। চ্যানেলে আজকাল যে সকল জাহাজ এইদিক সেইদিক হইতে পৌঁছিতেছে, উহা সম্পূর্ণরূপে বরফে ঢাকা পড়িয়াছে। প্যারিসের বাজারসমূহে গরীব দুঃখীরা কাঁপিতে কাঁপিতে জীবনপাত করিতেছে। ইতালীর হ্রদ ও খালগুলি জমিয়া গিয়াছে। বিজ্ঞান এবং পৃথিবী ও আকাশের ঘটনাবলী সম্পর্কিত বিশেষজ্ঞগণ কি এই কথার কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেন যে, যদি প্রকৃতির এই মহান কারখানা সর্বকাল হইতেও সর্বকালের জন্য এক নির্ধারিত বিধানের অনুগামী না হইত এবং যদি সর্বশ্রেষ্ঠা ও সর্বশক্তিমান নিয়ন্ত্রণকারী এক সত্তা স্বেচ্ছায় তাঁহার ইচ্ছাকে প্রয়োগ না করিতেন তবে

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে প্রকৃতির অবস্থায় কখনো কখনো কেন এইরূপ অস্বাভাবিক ঘটনাবলীর প্রকাশ ঘটে? এইরূপ ঘটনাবলী হইতে কি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায় না যে, ইসলামই পৃথিবীতে এইরূপ একটি ধর্ম যাহার বিশ্বাসসমূহ মানিলে মানুষ কোন অবস্থাতে হোঁচট খাইতে পারে না।* অন্যথা নাস্তিকরাতো একদিকে আছেই। অন্যদিকে অধিকাংশ ধর্মের বর্তমান অনুসারীরাও এইরূপ অবস্থায় তাহাদের বিশ্বাসের যৌক্তিকতার কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারে না।"

অতঃপর নূর আকর্সা পত্রিকা ১৯০৭ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় লেখে যে, হংকং-এ এত প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হইয়াছে যে, দশ মিনিটের মধ্যে বন্দরের আশে পাশে প্রায় একশত চীনা মারা গিয়াছে। নূর আকর্সা পত্রিকা ১৯০৭ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় আরো লেখে যে, এই সপ্তাহে আর্মেনিয়ায় এত জোরে শোরে বৃষ্টি হইয়াছে যে. ইহা বর্ষাকালকেও হার মানাইয়া দিয়াছে এবং দুই দিন প্রচণ্ড শীলাপাতও হইয়াছে।*

আমি ইতিপূর্বে লিখিয়াছি যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী ঘটনা ঘটার নয় মাস পূর্বে অর্থাৎ ১৯০৬ সালের ৫ই মে তারিখে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। অতঃপর নয় মাস পরে এইরূপ সুস্পষ্টভাবে ইহা প্রকাশিত হইল যে, পাঞ্জাব, ভারতবর্ষ, ইউরোপ ও আমেরিকার সকল পত্র-পত্রিকা ইহার চাক্ষুস সাক্ষী হইয়া গেল। অতঃপর যে কোন বিবেকবান ব্যক্তি

---

* টীকা: এইরূপ অস্বাভাবিক ঘটনা হইতে কেবল এই সিদ্ধান্তেই পৌঁছানো যায় না যে, ইসলাম সত্য, বরং ইহা সুস্পষ্টভাবে আমাদিগকে এই সিদ্ধান্তেও উপনীত করে যে, যে ব্যক্তি প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবীদার এবং নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই দাবীর সহিত এইরূপ অস্বাভাবিক ও সর্বব্যাপী ঘটনার খবর দিয়াছে সে সত্যবাদী এবং সে খোদার পক্ষ হইতে আগমন করিয়াছে।

* টীকা: আমি নূর আকর্সা পত্রিকার সম্পাদককে জিজ্ঞাসা করি, ইঞ্জিলের কোন অনুসারীও কি এই মহান ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিল, যাহা সারা দেশে বরং সারা পৃথিবীতে চক্রের ন্যায় পরিব্যাপ্ত হইয়া গেল? যদি এই ভবিষ্যদ্বাণী খোদার তরফ হইতে না হইয়া থাকিত তবে ইহা এইরূপ কোন ব্যক্তির তরফ হইতে ছিল, যে কুদরত প্রদর্শনে খোদার সমান ছিল। যখন আগমনকারী প্রতিশ্রুত মসীহ খোদার সাক্ষ্য নিজের জন্য পেশ করিয়া দিলেন তখনও উহাকে না মানা কি ঐ সকল ইহুদীর বৈশিষ্ট্য নহে, যাহারা মসীহের মোজেযাসমূহ দেখিয়াও তাঁহার সহিত দুশমনী করিল এবং তাঁহার সহিত যাহা ইচ্ছা তাহাই করিল?

ভাবিতে পারে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞান কোন মানুষের থাকে না এবং না কোন মিথ্যাবাদীর এই শক্তি আছে যে, সে মিথ্যার ভিত্তিতে খোদায়ী শক্তিকে নিজে দেখাইবে। ইহা কত বড় মহান নিদর্শন যে, সর্বশক্তিমান খোদা বিগত দুইটি বসন্তে দুইটি ভূমিকম্পের খবর দিয়াছিলেন অর্থাৎ ১৯০৫ সালে ও ১৯০৬ সালে। অনুরূপভাবেই তৃতীয়বার পুনরায় বসন্ত সম্পর্কে এই খবর দিলেন যে, ১৯০৭ সালের বসন্ত ঋতুতে প্রবল বৃষ্টিপাত হইবে, খুব শীত পড়িবে এবং বরফ পড়িবে। সুতরাং তদ্রূপই ঘটিল এবং বড় শান-শওকতের সহিত এই ভবিদ্বাণী পূর্ণ হইয়া গেল। فالحمد لله على ذالك

এই ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে আরো একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল, যাহা ঐ সময়েই রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স, বদর, ও আল হাকাম পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা এই যে,—

দেখ, আমি তোমার জন্য আকাশ হইতে বর্ষণ করিব এবং যমীন হইতে নির্গত করিব। আঙ্গিণায় নদী বহিবে। যাহারা তোমার বিরুদ্ধবাদী তাহাদিগকে পাকড়াও করা হইবে।

يا تيك من كل فج عميق - يا تون من كل فج عميق والقى به الرعب العظيم -
ويل لكل همزة لمزة - سا كرمك اكراما عجبا -

(অর্থ:—তোমার নিকট দূর দূর হইতে গভীর পথে সম্পদ আসিবে। তোমার নিকট দূর দূর হইতে লোক আসিবে। আমি ইহার দ্বারা ভীতি সঞ্চার করিব। দুর্ভোগ প্রত্যেক অপবাদকারী ও পরনিন্দাকারীর জন্য। আমি তোমাকে বিস্ময়কর সম্মান দান করিব—অনুবাদক) আকাশ ভঙ্গিয়া পড়িল। এই সকল ভবিষ্যদ্বাণী বৃষ্টিপাত সম্পর্কে। ইহার সাথে এই কথাও বলা হইয়াছে যে, ঐ প্রবল বৃষ্টিপাত দুশমনদের জন্য ক্ষতিকর হইবে। সম্ভবতঃ ইহার অর্থ এই যে, প্রবল বৃষ্টিপাত প্লেগ ও বিভিন্ন প্রকারের রোগ সৃষ্টি করিবে।* এবং কোন কোন ফসলের ক্ষতি হইবে। আরবী ইলহামের অর্থ এই যে, এই সকল নিদর্শন প্রকাশের পর মানুষ নূতনভাবে প্রত্যাবর্তন করিবে। সকল পথ দিয়াই তাহারা আসিবে, এমনকি পথ গভীর হইয়া যাইবে। দূর দূর হইতে মানুষ নগদ অর্থ ও বিভিন্ন প্রকারের উপঢৌকন পাঠাইবে এবং দুশমনদের উপর মহান প্রভাব পড়িবে। ঐ সময় অপবাদকারী ও পরনিন্দাকারীদের উপর অভিসম্পাত বর্ষিত হইবে এবং আমি তোমাকে এক মহান সম্মান দান করিব। এত বৃষ্টি হইবে যেন আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িবে। (ক্রমশঃ)

---

* টীকা: সম্ভবতঃ এই বাক্যের অর্থ এই যে, এই সকল নিদর্শনের পর সকল দুশমন সম্পূর্ণরূপে লা-জবাব ও নিরুত্তর হইয়া পড়িবে।

জুমুআর খুতবা

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ)

[১১ই জুলাই '৯৭ ইং লণ্ডনস্থ মসজিদে-ফযলে প্রদত্ত]

অনুবাদ : মাওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ,
সদর মুরব্বী

(গত সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর)

আমি আপনাদের জানিয়ে দিতে চাই যে, ভারতে বিরোধিতার সব রকম কৌশল ও প্রচেষ্টার ব্যর্থতার পর বিরুদ্ধবাদীরা এখন তাদের সেই সবচে' ঘৃণ্য হাতিয়ারটি হাতে তুলে নিয়েছে, যা পাকিস্তানে তাদের পথপ্রদর্শক নেতারা ব্যবহার করেছিল। হিন্দুদের কাছে সকাতর অনুরোধ করা হচ্ছে, আহমদীদেরকে যেন অমুসলিম ঘোষণা করা হয়। পাগলামিরও একটা সীমা আছে। (কিন্তু) কতো বড়ো বোকামী যে তারা করছে তা তারা ঠাহর করতে পারছে না। বস্তুতঃ এ যাবৎ আমি স্বয়ং জামাতকে বারণ করে রেখেছিলাম এই বলে যে, এরূপ কোনও আন্দোলন চালাবেন না, যদ্দরুন আমাদেরকে মুশরেকদের সাথে মিলিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে কোনও রকম কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু তারা কার্যতঃ অনুরূপ আন্দোলনে নেমে গেছে। অতএব, এখন আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাতের পক্ষে এর প্রতিরোধে জবাবি কার্যক্রম গ্রহণের অনুমতি রয়েছে। আমি তাদের বলেছি, এখন আপনারা এতদুপলক্ষে তৎপর হোন। ধৈর্যের উপর নিজেরা অবিচল থেকে ভারতের হিন্দুদেরকে বলুন, "আপনারা সেই ন্যায়পরায়ণতা দেখান যা পাকিস্তান দেখাতে পারেনি। আহ্‌মদীরা কেন অমুসলিম, তার কারণ দর্শাবার জন্যে এই উলামাকে আপনারাই আহ্বান করুন। আহ্‌মদীরা কী ক'রে অমুসলিম হতে পারে সে-সম্পর্কে তো আপনাদের কিছুই জানা নেই। অতএব, প্রথমে সন্ধান তো করুন, আহ্‌মদীরা কেন অমুসলিম। আহ্‌মদীরা এদের সম্পর্কে এদের নিজেদের লিখিত ফতোয়া দেখাবে, যেগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে এরা সকলেই একে অন্যের দৃষ্টিতে অমুসলিম বলে স্বীকৃত।" কাজেই অ-মুসলিম ঘোষণার হাতিয়ারই যদি তারা ব্যবহার করতে উদ্যত হয়ে থাকে, তাহলে এই ময়দানেই মোকাবেলা হয়ে যাক। আমি সুনিশ্চিৎ জ্ঞানের ভিত্তিতে আপনাদের জানাচ্ছি যে, অ-আহ্‌মদী মুসলমানদের মাঝে এরূপ-কোন একটিও ফির্কা নেই, যার সম্পর্কে অন্যান্য ফির্কার উলামা ও তাদের অনুসারীগণ ফতোয়া দেয় নি যে, ঐ ফির্কাভুক্ত লোকেরা ইসলামের গণ্ডীবহির্ভূত অ-মুসলিম ; বরং

তাদের কুফরী কাদিয়ানীদের চেয়েও কঠিনতর। অতএব, তোমাদের ইচ্ছা যদি এটাই হয়ে থাকে তাহলে চল, এ ব্যাপারটিতেই মোকাবেলা হোক। বস্তুতঃ ভারতে এটা উত্তম মোকাবেলা হবে। ভারত সরকারের যদি (সাধারণ) জ্ঞান-বুদ্ধি থাকে তাহলে ওরূপ অ-গণতান্ত্রিক দাবীর দিকে তাকিয়ে দেখাও পসন্দ করবেন না। কিন্তু যদি কিছু করতেই হয় তাহলে এটা (—উলামাদের এই দাবী) তাদের জন্য এক সুযোগ বয়ে এনেছে। এর ফলে তাদের অন্যান্য সব সমস্যারও সমাধান হয়ে যাবে। সমস্ত মুসলমান ফির্কাগুলিকে ভারত সরকার সুযোগ দিক, তারা যাতে তাদের প্রত্যেকে দলিল-প্রমাণের দ্বারা সপ্রমাণ করে, কেন কেবল তারাই মুসলমান এবং (তাদের ব্যতীত) অন্যান্যরা কেন মুসলমান নয়। আমরা এই মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। বস্তুতঃ এমতাবস্থায় ভারত সরকার যদি ইনসাফের সাথে এ কাজটিকে হাতে নেন এবং ইনসাফের সাথে এর নিষ্পত্তি করেন, তাহলে সমগ্র ভারতবর্ষে আহমদীয়া মুসলিম জামাত ব্যতীত অন্য কোনও মুসলিম জামাত হিসেবে অবশিষ্ট থাকবে না। অন্যান্য সব ফির্কার মুসলমান অ-মুসলিম বলে সাব্যস্ত হবে। এর ফলশ্রুতিতে হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা-ফাসাদ ইত্যাকার যে গোলযোগ প্রায়শঃ সেখানে লেগে থাকে—এ সমস্যাটিরও চিরতরে সমাধান হয়ে যাবে। আহমদীদের ব্যতীত অন্য কেউ-ই মুসলমান থাকবে না। অন্যেরা সবাই অ-মুসলিম হিসাবে আপনাদের সংবিধানে লিপিবদ্ধ হবে। অ-মুসলিমরা অ-মুসলিমদের সাথে যা-ইচ্ছা ব্যবহার করুক, তাতে মুসলমানদের কী আসে যায়। অ-মুসলিমরা যদি পরস্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয় তাতে আমাদের কী আসে যায়। একশ' ভাগ বাস্তব সত্য যে, পাকিস্তানেও যদি উক্ত বিষয়ে ন্যায়-বিচার খাটানো হতো, এতটুকুও যদি ইনসাফের ধার ধারা হতো, তাহলে একমাত্র আহমদীয়া জামাতই রয়েছেন—যাদের ইসলাম অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়। বস্তুতঃ অন্যান্য এই সবার ইসলাম স্বয়ং তাদেরই একে অন্যের ফতোয়ার তলোয়ারের দ্বারা কাটা পড়েছে। প্রত্যেক ফির্কার একশ' ভাগ অব্যর্থ ও সুনির্দিষ্ট ফয়সালা মজুদ রয়েছে এই মর্মে যে, তাদের ব্যতীত অন্যান্য সব ফির্কাই মিথ্যে ও ইসলামের গণ্ডীবহির্ভূত। (ফির্কাসমূহের) নাম নিয়ে নিয়ে তাদেরকে অ-মুসলিম বলে ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন, সাম্প্রতিক আন্দোলনের যারা হোতা ও পাণ্ডা, তাদের সম্পর্কে ভারতবর্ষের সংখ্যাগরিষ্ঠ ফির্কার চূড়ান্ত ফয়সালা হচ্ছে, "এদের ইসলাম মনগড়া, নিছক কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন, এদের ঘরে যে-সব বাচ্চার জন্ম হয় ওরা সবই 'গয়ের-শর্‌য়ী'—শরীয়ত-মতে অবৈধ। ওরা ওয়ারিশ হতে পারবে না। ঐ ফির্কার কোনও ব্যক্তি যদি মসজিদে ঢোকে তাহলে তাকে মারধর করে মসজিদ থেকে বের করে দাও এবং মসজিদ ধোয়াবার খরচও তার কাছ থেকে উসুল কর।" এসব ফতওয়া তারা সবাই একে অন্যের বিরুদ্ধে দিয়ে রেখেছে। এগুলো যদি আমি পাঠ করে শোনাই তাহলে আপনারা অবাক

হয়ে যাবেন কীভাবে যে এরা একে অন্যেকে অ-মুসলিম ঘোষণা করেছে। তারপর এরাই কিনা আবার একজোট হয়ে আহমদীদের বিরুদ্ধে লেগেছে। কিন্তু এরূপ এক মুক্ত (পরিবেশ সম্পন্ন) দেশ, যেখানে দলিল-প্রমাণ প্রকাশ্যে খোলাসাভাবে পেশ করা যায়, আমরা সেখানে দেখাবো, যারা আমাদের বিরুদ্ধে অ-মুসলিম ঘোষণার দাবী জানাচ্ছে তাদের তো নিজেদের মুসলমানিত্বই প্রমাণিত নয়। না হয় তারা প্রমাণ করে দেখিয়ে দিক। যা-ইচ্ছা মাপকাঠি তারা নির্ধারণ করুক, সেটি-ই আমরা ব্যবহার করে দেখাব তাদের সহ তাদের জোটভুক্ত সব ফির্কার বিরুদ্ধে। আর ঐ সমস্ত মাপকাঠিতে আহমদীয়া জামাত আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে খাঁটি মুসলিম বলে সাব্যস্ত হবে। বস্তুতঃ আমার সম্মুখে একটি পরিপূর্ণ স্কীম রয়েছে, যার প্রেক্ষিতে আপনাদের সামনে আমি এ কথাগুলো বলছি। আমার বক্তব্যে অতিশয়োক্তির বিন্দু মাত্র নেই। তদনুযায়ী যদি ন্যায়-বিচার হয় তাহলে একশ'ভাগ ফয়সালা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পক্ষে হবে, কখনও বিপক্ষে হবে না।

সুতরাং, ভারতস্থ আহমদীয়া জামাতকে আমি এ দিকে সবিশেষ মনোযোগ দিতে বলছি যে, এখন সঠিক সময়, কাজেই পাল্টা (জবাবি) কার্যক্রম আরম্ভ করুন এবং ন্যায়পরায়ণ হিন্দুদেরকে এতে সামিল করুন; তেমনি সেখানে বসবাসকারী অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায়পরায়ণ লোকদেরকেও। তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন, আপনারা যদি গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে চান তাহলে সবার আগে এই প্রতিবন্ধকতা ও ঝঞ্ঝাটের অবসান ঘটান। যদি এ ব্যাপারটিকে গ্রহণ করতে চান তাহলে ন্যায়-বিচারের সার্বিক চাহিদা পুরণের মাধ্যমে গ্রহণ করুন এবং দেখুন যে, সত্যিকার অর্থে কারা মুসলিম আর কারা অ-মুসলিম। অর্থাৎ আমরা নিজেদের এবং অন্যান্য সবার নিজস্ব লিখিত সনদ ও বক্তব্য, আকীদা-বিশ্বাস এবং কুরআন হাদীসের আলোকে সমস্ত দলিল-প্রমাণ তুলে ধরতে প্রস্তুত রয়েছি। আসলে তাদের পরিচালিত এই নয়া আন্দোলনটিও তাদের মুখের উপরেই আছড়ে পড়বে। (এই ময়দানে) আহমদীয়া জামাতের মোকাবেলায় তারা সম্পূর্ণ নিরুপায়। তাদের এ আন্দোলনই স্পষ্ট প্রমাণ বহন করে যে, তাদের অন্তরে তারা এই দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে যে, বস্তুতঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাতই জয় লাভ করেছে। কেননা, অ-মুসলিম ঘোষণা করার জন্য সরকার সমীপে তাদের আবেদন-নিবেদনের দ্বারাই স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয় যে, জনগণের দৃষ্টিতে এরা আহমদীদেরকে অ-মুসলিম সাব্যস্ত করতে পারে নি, বরং সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। যদি এই মৌলবীরা ভারতের জনসাধারণের দৃষ্টিতে আহমদীদেরকে অ-মুসলিম বলে সাব্যস্ত করতে সফলকাম হতে পারতো, তাহলে এতো বিপুল সংখ্যায় আহমদীয়া জামাত সেখানে বিস্তার লাভ করতে পারতো না। সেজন্য এখন তারা মুশরিশকদের কাছে, যারা কিনা ওয়াহেদ-লা-শরীক

খোদাকেই মানে না, তাদের সমীপে সাহায্যের জন্য দোহাই দিচ্ছে, নইলে আহমদীরা তাদেরকে গ্রাস করে ফেলবে। তাদের আন্দোলনের সার-কথা এটাই।

বস্তুতঃ আহমদীয়া মুসলিম জামাত যতক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্যে অটল-অবিচল থাকবে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে কেউ তাদের কোনও ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। কিন্তু সেই সঙ্গে তওয়াক্কুলকেও যোগ করুন এবং তাতে যত্নবান থাকুন। দৃঢ় অস্থা রাখুন খোদাতে এবং নাজায়েয (অসঙ্গত) কলা-কৌশল কখনও গ্রহণ করবেন না। এ দু'টি শর্ত যদি আপনারা অবধারিতভাবে ধরে রাখেন, তাহলে অবশ্য-অবশ্যই আপনারা ছড়িয়ে যেতে থাকবেন।

এ আয়াতটির শুরুতে যে ক'টি কথা রয়েছে তা আমি স্পষ্ট করে তুলে ধরতে চাই। আল্লাহতা'লা বলেন, قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم —বল, হে আমার বান্দাগণ, যারা ঈমান এনেছ! তোমরা তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের তাকওয়া (খোদা-ভীরুতা) অবলম্বন কর।' "লিল্লাযিনা আহ্‌সানু ফি হাযিহিদ্‌ দুনিয়া হাসানাহ্‌"—তাকওয়া অবলম্বন ক'রে যাদের আমলে সৌন্দর্য প্রকাশ পাবে, সেজন্য দুনিয়াতেই তাদেরকে সুফল দান করা হবে। এখানে ইহা বলা হয়নি যে তারা অপেক্ষা করুক তাদেরকে মৃত্যুর পর পুরস্কার দেয়া হবে। যদি তা-ই বলা হতো, ধৈর্য ধারণের জন্য তাকিদ করার পর তাতেও কোন দোষ হতো না। খোদা তাঁর বান্দাদেরকে ধৈর্য ধারণের জন্য অদ্ভুত রকম সুন্দর উপায়ে উপদেশ দান করেছেন—অর্থাৎ সব্‌রের জন্য প্রবোধদানের সঙ্গে ওয়াদাও করেছেন যে, ইহকালেই তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করা হবে। সুতরাং, এখানে 'সব্‌র' বলতে মুমেনদের আল্লাহ্‌তে আস্থা রেখে অপেক্ষামান থাকাকে বুঝায়। বস্তুতঃ কুরআন করীমে অ-মুসলিমদের বেলায় সব্‌র বা ধৈর্যের উল্লেখ কোথাও নেই। জাহান্নামীদের সম্পর্কে আছে এই বলে যে, ধৈর্য ধর বা না ধর, তাতে কিছু আসে যায় না। তবে অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে আল্লাহ্‌তা'লা অপেক্ষার কথা বলেছেন এই বলে যে, তারাও অপেক্ষা করছে, তোমরাও কর। কিন্তু অবিশ্বাসী তথা অ-মুসলিমদের বেলায় 'সব্‌র' সংক্রান্ত বিষয়-বস্তু কোথাও আপনাদের দৃষ্টিগোচর হবে না। সব্‌র করা তারা জানেই না। যদি জানতো, তাহলে নিজেদের পরাজয় তাদের স্বীকার করা উচিত। যুক্তি ও দলিল-প্রমাণের মাধ্যমে প্রীতি ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে তারা চেষ্টা চালাতে পারে। খোলা রয়েছে এই ময়দান। যার ইচ্ছা এ ময়দানে অবতীর্ণ হয়ে মোকাবেলা করতে পারে। কিন্তু তাদের পক্ষে উক্ত পন্থা পরিহারের দ্বারা এটাই প্রতীয়মান হয় যে, তারা ধৈর্য ধারণ করতে পারে না, ধৈর্য ধরতে তারা জানেই না। বস্তুতঃ অধৈর্যশীলদের পরিণাম কখনও ভালো হয় না। এটা এক অমোঘ নিয়ম। বস্তুতঃ আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন, 'তোমরা সৎকর্ম সাধনে উৎকৃষ্ট পন্থা দেখাও"। তা এ অর্থে নয় যে, এর ফলাফল দেখার জন্য তোমাদের মৃত্যুর পরপারের অপেক্ষা করতে হবে। বরং সৎকর্মে উৎকর্ষ সাধন

এবং ধৈর্য ধারণে দেখতে দেখতেই এ দুনিয়াতে তোমাদের চোখের সামনে অতি সুন্দর ফলোদয় ঘটতে তোমরা দেখতে পাবে। আর এই ফলোদয়ের অন্যতম হচ্ছে : "ওয়া আর-যুল্লাহে ওয়াসেয়াহ্"—খোদার পৃথিবীকে তারা সম্প্রসারিত ও সুপ্রশস্ত হতে প্রত্যক্ষ করবে। 'পৃথিবী সুপ্রশস্ত' হবার বিষয়টিকে যদিও আয়াতের শুরুতে বর্ণিত বিষয়ের পরে পরেই রাখা হয়েছে, কিন্তু বিষয়টি স্পষ্টতঃ ধৈর্যশীলতার সাথেই সম্পৃক্ত। সুতরাং ধৈর্যশীলদের উল্লেখের আগেই 'আরযুল্লাহে ওয়াসেয়াহ' বলেছেন, যদিও এর সম্পর্ক রয়েছে ফিদ্ দুনিয়া হাসানা'-এর সাথে। প্রথমতঃ ধৈর্যশীলদের পক্ষে এই ধারণা যে, 'খোদার পৃথিবী সুপ্রশস্ত'—ইহা তাদের সাহস-সঞ্চারের কারণ হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সৎকর্মে উৎকর্ষ সাধনকারীদেরকে স্থানগত প্রশস্ততা ও সম্প্রসারণের ওয়াদা দেয়া হয়েছে। এ দুনিয়াতে তাদেরকে কৃতকর্মের কী কী সুফল দেখানো হবে? একটি হচ্ছে, খোদার পৃথিবী অত্যন্ত প্রশস্ত অর্থাৎ নতুন নতুন (দেশ ও) এলাকা তোমাদের দেখানো হবে। নতুন নতুন জাতিবর্গ তোমাদের সামনে আনয়ন করা হবে। যেমন কিনা হযরত ঈসা মসীহ (আঃ) সম্পর্কে বাইবেলে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, 'কুমারীগণ তার জন্য অপেক্ষা করবে'—কুমারী বলতে পুরানো জাতিবর্গকে বুঝায়, যাদের উপর পূর্বাহ্নে (কখনও) খোদার বাণীর দায়িত্বভার ন্যস্ত করা হয় নি। অতএব, "আরযুল্লাহে ওয়াসেয়াতুন"—আল্লাহ্র বাণীটি আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ক্ষেত্রেও একটি ভবিষ্যদ্বাণীর মর্যাদা রাখে এ অর্থে যে, তাদের জন্য, তাদের মাধ্যমে আল্লাহ্র বাণীর বিস্তৃতি ঘটার লক্ষ্যে তাঁর পৃথিবীকে সুপ্রশস্ত করা হবে। যেমন, আঁ হযরত (সাঃ) সম্পর্কে ইহাও বলা হয়েছে যে— اولا يرون انا نأتي الارض ننقصها من اطرافها - افهم الغالبون

(সূরা আম্বিয়াঃ ৪৫)

অর্থাৎ, তারা কি দেখে না যে, তাদের সকলের দুনিয়া সংকুচিত হচ্ছে এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর দুনিয়া বেড়ে চলেছে। সুতরাং এই হচ্ছে "আরযুল্লাহে ওয়াসেয়াতুন"-এর একটি অর্থ। অতএব, তোমাদের জগৎ আরও সম্প্রসারিত হবে। যে-সব এলাকা পর্যন্ত আল্লাহ তোমাদেরকে সফলতা দান করেন, সে-পর্যন্তই তোমরা থেমে যেও না। যদি তোমরা তালাশ কর তাহলে দেখতে পাবে যে, আল্লাহ্র বিশাল দুনিয়া পড়ে আছে কাজ করার জন্য।

বস্তুতঃ এখানে একটি মৌলিক করণীয় হিসেবে দেখানো হয়েছে, যা সাধারণভাবে মানুষের গোচরীভূত হয় না বলে তবলীগ বা প্রচারকারীদের সচরাচর ক্ষতি হয়ে যায়। যে-সব জায়গায় আল্লাহ্তা'লা সংখ্যাগরিষ্ঠতা দান করেছেন, তাদের উচিত দেখা—"আরযুল্লাহে ওয়াসেয়াহ্"—আল্লাহ্র দুনিয়া এতো প্রশস্ত যে, হাজার হাজার মাইল ব্যাপী বিস্তর অঞ্চল চোখে পড়ছে, যেখানে মুসলমান নেই। অতএব, নিজেদের কোন ক্ষুদ্রপরিসর এলাকায়

প্রাধান্য দেখে—তা যত বড়োই হোকনা কেন, ইহা ভুলে যাওয়া যে, "আরযুল্লাহে ওয়াসেয়াহ্"—এটা তাদের বোকামী এবং ক্ষতির কারণ হবে। ভারতবর্ষে অর্থাৎ এই গোটা উপমহাদেশ আমি লক্ষ্য করেছি যে, কোন কোন সীমিত এলাকায় যেখানে কোন জামাত সংখ্যাগরিষ্ঠতা বা সংখাধিক্য লাভ করেছে, তাতে তারা মনে করেছেন যেন সারাটা জেলা বা গোটা এলাকাই জয় করে ফেলেছেন। এটা চিন্তা করেন নি যে, "আরযুল্লাহে ওয়াসেয়াতুন"—তোমাদের জগৎ তো নেহাৎ ক্ষুদ্র ছিল, চতুর্দিক তাকিয়ে দেখ, বিস্তর এলাকার পর এলাকা চারদিকে খালি পড়ে আছে। যেখানে আপনাদের কাজ বাকি রয়েছে।

সুতরাং আল্লাহ্তা'লা উৎকর্ষের পর উৎকর্ষ, সৌন্দর্যের পর সৌন্দর্য দান করতে থাকেন। আপনাদের প্রশস্ততা লাভের সাথে-সাথে অন্যান্য প্রশস্ততা হাতছানি দেয়, আহবান জানিয়ে মনোযোগ আকর্ষণ করে। আর এ পয়গামটি ভেসে উঠেঃ "ওয়া আরযুল্লাহে ওয়াসেয়াতুন।"—এটুক স্থান যা আল্লাহ্ তোমাদের সোপর্দ করেছেন ওটাই যথেষ্ট বলে মনে করেছেন। অথচ দুনিয়ার আরও বিস্তর অংশ পড়ে আছে। অনুরূপ, চারদিক আপনারা যখন তাকাবেন, দেখে বিস্মিত হবেন যে, অনেক অনেক এলাকা পড়ে আছে যেখানে আহ্মদীয়তের কোন চিহ্ন নেই। ইংল্যাণ্ডের জামাতকে আমি এ দৃষ্টিকোণ থেকে মনোযোগ আকর্ষণ করছি। তারা প্রথম সম্বোধনের লক্ষ্যস্থল। তেমনি বাদ বাকী বিশ্বের সকল জামাত সম্পর্কে আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সেই সঙ্গে তারাও সমানভাবেই আমার বক্তব্যের লক্ষ্যস্থল বটে।

তবে (ইংল্যাণ্ডের যারা) তাদেরকে আমি লক্ষ্য করে বলছি। আমাদের কর্মীরা উঠে নিজেদের জামাতগুলোতে এসে পৌঁছে যান, যেখানে আহ্মদীগণ রয়েছেন। অথচ তাদের ছেড়ে যদি তারা অন্যান্য জায়গায় চলে যান, তাহলে ঐ শহর বা গ্রামটিতে তাদের সংখ্যা আটার মধ্যে যে অল্প একটু লবণ দেয়া হয়, সে-পরিমাণ আছে বলেও মনে হবে না। "আরযুল্লাহে ওয়াসেয়াতুন"—এর বিষয়-বস্তু তো প্রত্যেক জামাতের চারদিক থেকেই শুরু হয়ে যায়। ওদের ব্যতীত অন্যান্য শহর ও গ্রাম-গঞ্জ গুণে দেখুন, সে-সব কতগুলো। হিসেব করলে বিস্মিত হবেন এই বলে যে, কোথাও যদি জামাতের সংখ্যা সত্তর হয়ে থাকে, তাহলে চারদিকের জনপদগুলো সত্তর হাজারেরও বেশী হবে। আল্লাহ্তা'লাই ভাল জানেন, পরিসংখ্যান করে আমি দেখিনি। তবে এটুকু আমি জানি যে, প্রত্যেক county তে অসংখ্য বসতি রয়েছে। ছোট ছোট গ্রাম, যেগুলোকে hamlets বলা হয়। সেখানে কোন কোন জমিদার আছেন, যাদের নিজেদের এক একটা বিরাট আয়তন বিশিষ্ট জন-বসতি রয়েছে।

যদি আপনারা ভারতবর্ষে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত জামাতগুলোকে কেন্দ্র করে সেগুলোর চাররদিকে শহর-নগর ও গ্রাম-গঞ্জ গণনা করেন তাহলে সত্তর হাজারেরও অধিক দাঁড়াবে।

এই হচ্ছে "আরযুল্লাহে ওয়াসেয়াহ্" সংক্রান্ত বিষয়-বস্তু। কাজেই, কেবল সেখানেই যদি পৌঁছেন যেখানে জামাত আছে, আর অন্যান্য সব জনবসতি ছেড়ে দেন, তাহলে ওটা অনেক বড়ো ধরণের বোকামি করারই নামান্তর হবে। পাকিস্তানে এখন আমার সামনে শিয়ালকোটের দৃষ্টান্তটি রয়েছে। সেখানে ক্ষুদ্র একটি এলাকা জুড়ে আহমদীদের যে সংখ্যাধিক্য ছিল, ওটাকে বহুকাল যাবৎ তারা গোটা জেলার উপর তাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার তুল্য বলে ভাবতে আরম্ভ করলেন। প্রকৃতপক্ষে ওরূপ ভাবাটা তাদের বড়ো ধরনের বোকামি ছিল যে, "আরযুল্লাহে ওয়াসেয়াতুন" সংক্রান্ত বিষয়-বস্তুটিতে মনোনিবেশ করেন নি। যদি করতেন তাহলে বুঝতেন যে, চারদিক যে-সব খালি জায়গা পড়ে আছে সেগুলোর তুলনায়ও এতদঞ্চলে জামাতের সংখ্যা যৎসামান্য বলেই প্রতীয়মান হয়। সেগুলো অনেক বেশী, যা তারা মৌলবীদের হাতে ছেড়ে দিলেন। সেখানে তারা 'মন্দ বৃক্ষ' লাগাতে শুরু করলো। অদ্ভুত ব্যাপার যে, জামাতগুলোর চারদিকে যে সব খালি জায়গা ছিল তা নিজেরা মৌলবীদের দখলে দিয়ে দিলেন। এই পদের যেসব জড়িবুটি রয়েছে, এগুলো আবার সুযোগ মত সচরাচর খুব দ্রুত বেড়ে গিয়ে বিস্তার লাভ করে থাকে। সেজন্য শিয়ালকোটে আমাদের জন্য এই সমস্যা দেখা দিলো যে, বিরূপ প্রোপাগাণ্ডা এতো বেশী করা হলো যে, আহমদী বসতিগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাসমান দ্বীপ বলে প্রতীয়মান হতে লাগলো। বরং তার চেয়েও ক্ষুদ্রতর। চতুষ্পার্শ্বে তবলীগকে তখন সম্পূর্ণ দুষ্কর করে দেয়া হলো (তবলীগ করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়লো)। এতো দীর্ঘকাল যাবৎ নীরবে এসব কিছু দেখতে থাকা আত্মম্ভরিতার দরুনও হতে পারে এই বলে যে, সংখ্যাধিক্যের প্রয়োজন ছিল, তা আমাদের হাসিল হয়েছে, আর কিছুর দরকার নেই। আগে যে বিষয়-বস্তু আমি বর্ণনা করে এসেছি উহাই ওরূপ ঘটার কারণ ছিল। মানুষ মনে করে সংখ্যাগত দিক দিয়ে প্রাধান্য গড়ে তোলাই যেন ধর্মের মূল লক্ষ্য। অথচ প্রকৃতপক্ষে 'মযলুমিয়ত'কে বাড়ানো এবং ধৈর্যশীলতার বৃদ্ধি সাধন করাই হচ্ছে ধর্মের আসল উদ্দেশ্য।

দুনিয়াতে যত সব খারাপি দেখা দেয়—তা জাতিবর্গের সংখ্যাগরিষ্ঠতার (বড়াইয়ের) দরুনই বটে। সংখ্যাধিক্যে যখন শক্তিসঞ্চার হয় তখন তাদের মাঝে অহংকার সৃষ্টি হয় এবং তারা যুলুম চালাতে আরম্ভ করে। বস্তুতঃ মযলুমিয়তকে এরূপে বাড়ানো এবং ধৈর্যশীলতার এতো বৃদ্ধি সাধন করা যাতে করে আপনারা যদি প্রাধান্য লাভ করেন তাহলে ধৈর্যেরই যেন প্রাধান্য লাভ হয়। প্রধান্য লাভ করেও যেন ধৈর্যে অটল-অবিচল থাকেন এবং সকলকে ধৈর্যের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান করেন। মযলুমিয়তের সাথে নিজেদের জড়িয়ে ধরে রাখুন এবং মযলুমিয়ত অর্থাৎ প্রতিশোধ গ্রহণে দূরে থাক বরং যুলুম-অত্যাচার সয়ে নেয়ার মাধ্যমে যালেমকে জবাব দিন। এমন কি, শক্তি সঞ্চার করে যালেম হবার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও

প্রতিশোধ গ্রহণ বা যুলুম-অত্যাচারকে সম্পূর্ণ পরিহার করুন। কেননা, অত্যাচারিত হবার ফল তো আপনারা দেখেছেন এবং উহার স্বাদও গ্রহণ করেছেন। আহমদীয়া মুসলিম জামাত প্রায়শঃ যুলুম-অত্যাচারের শিকার হয়ে এসেছে। মযলুমিয়তের ফলও আপনারা ভোগ করছেন এবং আপনারা জানেন যে, এর প্রতিফল হচ্ছে উৎকৃষ্টতর এবং অত্যন্ত পবিত্র, সুন্দর ও সুস্বাদু। এই ফল-বৃক্ষ আকাশ চুম্বি, যা বিশ্বব্যাপী ভূ-পৃষ্ঠে বিস্তার লাভ করবে এবং খোদা-তা'লা যদি চান তাহলে দুনিয়া জুড়ে প্রাধান্য লাভ করবে। অতএব, উক্ত বিষয়ের দিকেই মনোযোগ দিন। নিজেদের মযলুমিয়ত এবং ধৈর্যশীলতার মূল্যবোধগুলোর হিফাযত করুন। এবং "আরযুল্লাহে ওয়াসেয়াতুন" সংক্রান্ত বিষয়টির দিকে লক্ষ্য রাখুন। আল্লাহ্তা'লা যখন আপনাদেরকে বাড়াতে ও ছড়াতে থাকেন, তখন আপনারা যদি ধৈর্যশীলতাকে না বাড়ান ও ছড়ান এবং অহংকারী হয়ে বসেন, তাহলে 'আরযুল্লাহে ওয়াসেয়াহ্' আপনাদের জন্য আর থাকবে না। অন্যেরা এর অধিকারী হয়ে পড়বে। কৃষিকাজের ক্ষেত্রে আমি লক্ষ্য করেছি যে, কোন ফসলের ব্যাপারে যখন বিশেষ যত্ন নেয়া হয় এবং তত্ত্বাবধান করা হয়, তখনও সেখানে ক্ষতিকর ঐ মন্দ জড়িবুটি অবধারিতভাবে ঢুকবার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে, ক্ষেতের রক্ত চুষে সেখানে ঐ বিষ পৌছে দিতে, যা কৃষকের অনভিপ্রেত। আবার এমনও দেখা যায় যে, আগেথেকেই ঐ মন্দ জড়িবুটিগুলি সেখানে বাসা বেঁধে বসে আছে। তাতে প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। সেই পরিশ্রমের ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতাও হয়েছে যে, সেখানে লবণাক্ততারও দখল ছিল এবং ও-সব জড়িবুটিরও। আমি যতোদিন ঐ সব খামারে তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করেছি, ততোদিন ব্যবস্থাপকদের এই নির্দেশনা দান করেছি যে, সবটা জুড়ে হাত দিবেন না, বরং খণ্ড খণ্ডভাবে, ভাগ ভাগ করে ওগুলোকে আয়ত্ব করুন। বস্তুতঃ সব্র বা ধৈর্য ধারণের ইহাও একটি ধারা। কাজটা অনেক বড়ো—যেমন, পঞ্চাশ একর জমিকে আয়ত্বে নিতে হবে এবং ঐ পরিশ্রমের দ্বারা কৃষি কর্মকাণ্ডকে লাভজনক করে তুলতে হবে। যদি ধৈর্যের সাথে কাজ না করেন তাহলে তাড়াহুড়া করবেন এবং যাতে একধাপেই সমস্তটা এলাকা হাতের মুঠোয় এসে যায় ওরূপ বিশাল কোন প্রকল্প গ্রহণ করে বসবেন। তাতে গোটা এলাকা হাতে আসা দূরে থাক, বরং কিছুই ফল পাওয়া যায় না। সুতরাং তখন যে বিষয়গুলো আমি কৃষিতে আমার ব্যবস্থাপকদেরকে বোঝাতাম, তা এখন আমি সমগ্র জামাতকে বোঝাতে চাই। যেসব এলাকায় শত্রুরা নোংরামি ছড়িয়ে দিয়েছে, সেখানে প্রথমে কোন ক্ষুদ্র অংশকে বেছে নিয়ে বিশেষভাবে হাতে নিন এই ধারায়। তাদের ইসলাহ্ (সংশোধন) করুন। তাদের জমিগুলোকে সুস্থ ও উৎপাদনোপযোগী করে তোলুন। সে মতে ইনশাল্লাহ্তা'লা আপনাদের উপর "আরযুল্লাহে ওয়াসেয়া"-এর এক নতুন অর্থ উন্মোচিত হবে। তারপর আশে-পাশে তাকিয়ে দেখুন যে, শয়তান এবং দুশমনের বিষ-বৃক্ষ সেখানে কোথায়-কোথায় শিকড়

গেড়ে বসে আছে। তখন সেখানে আপনাদেরকে পাল্টা কার্যক্রম ও সংশোধনী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর সে এলাকাও আপনারা দুশমনের কবলমুক্ত করে আল্লাহ্‌র কাছে ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হবেন। এমনি ধারায়, প্রত্যেক দেশে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, সবখানেই অনুরূপ বহু কলুষিত জমি রয়েছে; সেখান থেকে তারা আমাদের প্রশ্ন করেন যে, সেগুলোকে আমরা কী করে সংশোধনমুখী করবো। প্রশ্ন এজন্য উঠে যে, অধৈর্য নিহিত থাকে তাদের স্বভাবে এবং তারা চায় শীঘ্র সেরে ফেলতে। কাজেই তা তারা করে উঠতে পারে না। তারা মনে করেন যে, তাদের কাছে আমার প্রত্যাশা বা নির্দেশ থাকে, তারা যেন তিন লাখ থেকে ছয় লাখে এবং ছয় লাখ থেকে বার লাখে পরিণত হন, তদ্দরুন তাদের মাঝে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেই সঙ্গে আমি কর্ম-পদ্ধতিও তো বাতলে দেই, যেগুলোর দ্বারা ছয় বারতে পরিণত হতে পারে। কিন্তু তা সব্‌র বা ধৈর্যশীলতার দ্বারাই সাধিত হতে পারে। ওরূপ কর্মপদ্ধতি অবলম্বন করাই উচিত, যদ্দরুন অবধারিতভাবে আপনারা সম্মুখে এগোবেন।

এ প্রসঙ্গে আপনারা স্মরণ রাখুন, নিজেদের আশেপাশে দেখে-শুনে অল্প অল্প করে এরূপ এলাকা পর্যায়ক্রমে হাতে নিন, যেখানে আপনারা (তবলীগের দ্বারা) সম্পূর্ণরূপে পা সুদৃঢ় করতে পারেন। দূর দূর এলাকাগুলোতে বার্তা পৌঁছে দেয়ার কার্যক্রম গ্রহণ করুন। উভয় কাজ যুগপৎ হওয়া আবশ্যকীয়। কেননা, ধূসর প্রান্তরের বিভিন্ন স্থানে মরুদ্যান স্থাপন করতে হয়। তারপর ঐ সব মরুদ্যান খোদাতা'লার ফযলে ছড়াতে আরম্ভ করে। উভয় পদ্ধতিতে কাজ করুন। প্রথমতঃ প্রত্যেক জামাতে নিজেদের আশে-পাশে খালি জায়গাগুলোতে লোকদের সংশোধনমূলক কাজে পরিশ্রম করতে শুরু করুক। দ্বিতীয়তঃ যে-সব এলাকা দূর দূর পর্যন্ত সম্পূর্ণ ফাঁকা পড়ে আছে সেখানে কোথাও না কোথাও চারা বপন করতে শুরু করুন, যাতে জায়গায়-জায়গায় সবুজের সমাহার চোখে পড়ে। অনুরূপভাবেই মানুষ অধৈর্য না হয়ে এগোতে থাকে। আর বিভিন্ন জায়গায় বৃক্ষ-লতা পরিদৃষ্ট হওয়ার দরুন কৃষক তাতে খুশী হয় এবং ক্রমে ক্রমে তার ক্ষেত সারা দেশব্যাপী বিস্তৃত হয়ে পড়ে। এখন আমাদের করণীয় কাজের পরিমাণ অনেক বেশী। এ বছরটির নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা যদি আমরা পেয়ে যাই তাহলে উহা আগামী বছর আবার দ্বিগুণ হবে। যা কঠিনতর স্তরে পরিণত বলে প্রতীয়মান হবে। কিন্তু কুরআন করীমে আল্লাহতা'লা যে সকল উপদেশ দান করেছেন, যা আঁ-হযরত (সাঃ) কার্যে পরিণত করে দেখিয়েছেন, সেগুলো যদি আপনারা মযবুতভাবে ধরে রাখেন, তাহলে আপনারা দেখবেন অসম্ভবও সম্ভবে পরিণত হবে। অবশ্য অবশ্যই হবে। এ কোন কল্প-কথা নয়। যে-সব জামাতকে আল্লাহ্‌তা'লা বিগত বছর অসাধারণ তওফীক দান করেছিলেন—যেমন, তারা তিন লাখ নতুন বয়াত করিয়েছিলেন, তারা ছয় লাখের টার্গেটের দরুন অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত ছিলেন। আমি তাদের বল্‌লাম, "আপনারা কী বানাতে পারেন?

বানাবেন তো আল্লাহ্‌তা'লা। আপনারা আল্লাহ্‌র কাজ তাঁর দিক-নির্দেশনাক্রমে করতে শুরু করুন। এরপর তওয়াক্কুল (—আল্লাহ্‌তে ভরসা) করুন। কর্মপ্রচেষ্টা ব্যতিরেকে তওয়াক্কুল কোন অর্থ বহন করে না। উটের হাঁটু বেঁধে দেয়ার পর তওয়াক্কুল আরম্ভ হয়। না বাঁধলে তওয়াক্কুল হয় না। অতএব, যে-সব হেদায়াত আপনাদেরকে দান করা হচ্ছে, সেগুলো পালন করতে শুরু করুন এবং ফলোদয়ের ভার আল্লাহ্‌র উপর ছেড়ে দিন।" তিন লাখ থেকে ছয় লাখ যাদের টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছিল, তারা ঐ সব নির্দেশানুযায়ী আমল করাতে ১০ লাখ নির্ধারণের জন্য বলেন। কেননা, আল্লাহ্‌র ফযলে সেদিকে তারা দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন। তারা এ বছর শেষ হওয়ার আগেই নূতন লক্ষ্যমাত্রাটিও পুরা করার ব্যাপারে পূর্ণ আশাবাদি। বস্তুতঃ ধৈর্য ধারণের ফলশ্রুতিতে সাহসও বেড়ে যায়। এর দরুন আল্লাহ্‌-তা'লা তাদের কর্ম-প্রয়াসের উৎকর্ষও বাড়িয়ে দেন। আগামী বছর আমি ছয়ের পরিবর্তে দশ লাখের টার্গেট নির্ধারণ করবো তা তারা জানে না এবং দশকে বিশে পরিণত করতে বলবো। এসব বিষয়ে চোখ মুদে এগিয়ে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। মূলতঃ তারা আল্লাহ্‌তে নির্ভরশীল হবেন। যদি তারা ওভাবে কাজ করেন, তাহলে দশ বস্তুতঃ বিশেই পরিণত হবে। আমি লক্ষ্য করছি, বহু দেশে জামাত এতো দ্রুত এগোচ্ছে যে, গতি এ অর্থে পাল্টে যায় যে, হিসাব রাখা সত্ত্বেও বেহিসাব হয়ে দাঁড়ায়। বেহিসাব এভাবে যে, আমরা আশাতীত পেতে থাকি—দ্বিগুণ থেকেও দ্বিগুণ হারে। কিন্তু পরিশেষে সাধারণতঃ দেখা যায়, সমগ্র জামাত তারপর অবশিষ্ট সমগ্র দেশের উপর প্রভাবশীল হয়ে পড়ে। তখন অল্প অল্প সংখ্যায় আসার পরিবর্তে গোটা দেশ আছড়ে পড়ে। যেন ভেঙ্গে পড়ে। যখন বন্যায় উত্তেজনা দেখা দেয় তখন এক পর্যায়ে এসে কিনারাগুলোকে দুর্বল করতে থাকে। তারপর আবছে পড়ে। তখন সকল বাঁধ ভেঙ্গে পড়ে যায় এবং নদীর সীমানা ছাড়িয়ে সারা দেশে ছেয়ে পড়ে। এদিক থেকে কোন কোন দেশে বাঁধ ভেঙ্গে আছড়ে পড়ার লক্ষণাবলী দেখতে পাচ্ছি। যদি আপনারা দোয়ায় আত্মনিয়োগ করেন তাহলে আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে আগামী দু'বছরের মধ্যে আল্লাহতা'লা এরূপ বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী দেখাবেন যা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কিন্তু সমগ্র জামাতের পক্ষে উল্লেখিত ঐ সকল জামাতের জন্য দোয়া করা আবশ্যকীয়। কেননা, যতোদ্রুতবেগে জামাত বিস্তার লাভ করবে, ততো বেশী আশঙ্কাবলীও রয়েছে। আগন্তুকদের শামলানোর কাজটি হচ্ছে অত্যন্ত কঠিন। এ প্রসঙ্গে আমি বিগত খোৎবায় কানাডার জামাতকে উদ্দেশ্য করে আপনাদের সকলকে নসীহত করেছিলাম যে, জ্ঞানের ক্ষেত্রে যে-সব মৌলিক দুর্বলতা রয়েছে, সেগুলো দূর করতে সচেষ্ট হোন। সে- ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম কুরআন করীমের দিকে সকলকে মনোযোগী করে তোলার প্রয়োজন। নিয়মিত দৈনিক তরজমা সহ কুরআন তেলাওয়াত করা হয় না এবং তরজমার সহিত কুরআন পড়ানো-শেখানো হয় না—এই করে আপনারা

বৃথা ও অন্তঃসারশূন্য বংশধরদের সম্মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। তারা নামে মাত্র আহমদী হয়ে থাকবে কেবল। কে জানে, তা-ও কতো দিনই বা থাকবে ?! কাজের আহমদীতে পরিণত হতে পারবে কিনা, তা আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন। কিন্তু যাদেরকে শৈশবকাল থেকে কুরআন শিখানো হয় এবং গৃহের উপর কুরআনের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় সে-সব গৃহবাসীর কুরআন (—পাঠ) অবশিষ্ট জনপদের উপরও প্রাধান্য লাভ করে থাকে। আগে নিজেদের গৃহে কুরআনকে প্রবল করে তুলুন। প্রত্যেক বাচ্চার উপর ফরয করে দিন, সে যেন কুরআন পড়ে, বোঝে, তাতে (গভীর) মনোনিবেশ করে এবং প্রতিদিন আবশ্যকীয়ভাবে কুরআনের কিছু না কিছু 'ইরফান' (তত্ত্বজ্ঞান) আহরণ করতে থাকে, যাদ্দরুন তার নিজের তরবীয়ত হতে শুরু করে। ইনশাল্লাহতা'লা, আগামীতে কোন খোৎবায় অপেক্ষাকৃত অধিক সবিস্তারে এ সম্পর্কে আলোকপাত করবো। আপাততঃ এটুকু বর্ণনা করাই উদ্দেশ্য ছিল যে, "আরযুল্লাহে ওয়াহেতুল"—খোদাতা'লার জগৎ সুপ্রশস্ত। যা আমাদের জন্য সম্প্রসারিতও হচ্ছে এবং এতদ্ব্যতীত আরও দূরের অঞ্চলগুলোও আমাদের গোচরীভূত হতে আরম্ভ করেছে, যা ইতো-পূর্বে একেবারেই দৃষ্টির অগোচরে ছিল। সেখানে অনেক বড়ো বড়ো কাজ বাকী পড়ে আছে।

ভারত ব্যতীত আরবে—অর্থাৎ আরবী ভাষাভাষী যে-সব দেশ রয়েছে —সেগুলোতে আল্লাহ্‌তা'লার ফযলে বিস্তর কাজ পড়ে আছে। সম্প্রতি কানাডা সফরকালে সেখানে আমাকে আরবরা বড়ই জোরেশোরে প্রশ্ন করেছেন, 'আপনারা কোথায় ছিলেন এতো দিন ? কেন বলেন নি এতো ভালো শিক্ষা ? এথেকে কেন আমরা বিভ্রান্ত হয়ে থাকলাম ? এথেকে কেন আমাদের বঞ্চিত রাখা হলো ?" আমি তাদেরকে বুঝিয়ে বললাম, "আমরা রাখি নি, আপনাদের বড়োরা আপনাদেরকে বঞ্চিত রেখেছে। হয়তো মৌলবীরা রেখেছে, নয়তো সরকারগুলি। আমাদের তো চেষ্টা ছিল সবসময়ই। ধৈর্যের সাথে ক্রমাগত আমরা আরবদেরকে আগ্রহ ভরে চেয়েছি, সদা ভালোবেসেছি, যেমন কিনা রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) বলেছিলেন। এবং আমাদের সর্বাপেক্ষা কল্যাণকারী রসূলের এহসান আমরা কখনও ভুলিনি। তিনি যে তোমাদের মধ্যে থেকে পয়দা হয়েছেন এবং তোমরা সেই জাতি, যারা সমস্ত জগদ্ব্যাপী ইসলামের ইহসানসমূহ ছড়িয়েছো। এই জাতির আমাদের উপর একটি হক্‌ বর্তায়। কোন না কোনভাবেও এই ইহসানের বিনিময় পরিশোধে আমরা সচেষ্ট থাকবো।" অত্যন্ত প্রীতি ও সৌহার্দ্রের সাথে আমি তাদের বুঝিয়ে বলি যে, তাদের ধর্মীয় নেতারা এবং তাদের সরকারসমূহ এই পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছেন। ইহাও জামাতের ধৈর্যেরই পরিচয় যে, এতদ্‌সত্ত্বেও চেষ্টা কখনও ছেড়ে দেয় নি। আকাশ থেকে এখন যে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর সত্যতার সম্প্রচারিত বাণী ও

সচিত্র শব্দ নেমে আসছে, ইহাও ধৈর্যেরই ফলশ্রুতি এবং আল্লাহ্‌র পৃথিবী সম্প্রসারিত হবার ইহাও একটি নিদর্শন। "আরযুল্লাহে ওয়াসেয়াহ্"-এর এই শেষ অর্থটি আমি আপনাদের সম্মুখে উপস্থাপন করছি যে, আহমদীয়া জামাতকে আল্লাহ্‌তা'লা যে-সব প্রচার-মাধ্যম ও যোগাযোগ ব্যবস্থা দান করেছেন, যদ্বারা আগে যে-সব অঞ্চলে আমরা পৌঁছতে পারতাম না, যেমন আরব দেশগুলোতে,—এখন সেখানেও আকাশ থেকে আল্লাহ্‌তা'লার আওয়াজ (বাণী) তাদের উপর অবতীর্ণ হচ্ছে, তাদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে। এই মতে আল্লাহ্‌র এসব ভূ-খণ্ডও আহমদীদের দখলিভুক্ত হতে আরম্ভ করেছে।

অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌তা'লা জামাতকে যে-সব সুযোগ-সুবিধা দান করেছেন ঐ সব সামনে রেখে আপনারা যদি নিষ্ঠার সাথে চেষ্টা করতে থাকেন, তাহলে আপনারা ভূ-পৃষ্ঠ থেকেও বিস্তৃত হবেন, আকাশ থেকেও অবতীর্ণ হবেন। আশা করি যে-কাজ আপনাদের কাছে কঠিন বলে প্রতীয়মান হচ্ছে, তা ইনশাল্লাহ্‌ আগামী কয়েক বছরেই—নয়া শতাব্দী আরম্ভ হবার আগেই যথাসম্ভব সম্পন্ন হবে।

এ বিষয়টিতেই যখন আমি চিন্তা করছিলাম, তখন তাঁর অজস্র অনুগ্রহরাজীর ভারে ও কৃতজ্ঞতাবোধের চাপে আমার অস্তিত্ব-কাঠামো যেন ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হলো। এমতাবস্থায় আমি সকাতরে নিবেদন করতে লাগলাম, হে আল্লাহ্‌! মানুষদের তুমি স্বপ্ন দেখাও, তারা সে-গুলোর তা'বীরের (বাস্তবায়নের) অপেক্ষায় সারা জীবন কাটিয়ে দেয়। আর আমাকে তুমি প্রত্যেক বছরই নিত্যনূতন স্বপ্ন দেখিয়ে থাক এবং প্রত্যেক বছরই সে-গুলোর তা'বির বাস্তবায়িত করে থাক। এই এহ্‌সানের বদলা তো হতে পারে না—বদলার প্রশ্নই উঠে না। হ্যাঁ, শোকরগুযারির হক্‌ বর্তায়। তা-ও (যথাযথ) পালন করবার কারও সাধ্য নেই। তবে শোকরের পথে যদি আপনারা এগিয়ে যান, তাহলে আসমান থেকে আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তাগণ আপনাদের সাহায্যার্থে অবতীর্ণ হবে এবং এর ফলশ্রুতিতে আবার খোদাতা'লার পৃথিবীর অধিকতর পরিমাণ ভূভাগ আপনাদের জন্য বরাদ্দ হবে এবং সেগুলো আপনাদেরই হয়ে যাবে। (ভিডিও ক্যাসেট থেকে অনূদিত)

(২৩ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

মাত্র অক্ষরগুলি অবশিষ্ট থাকিবে। তাহাদের মসজিদগুলি বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ হইবে, কিন্তু হেদায়াতশূন্য থাকিবে। তাহাদের আলেমগণ আকাশের নিম্নস্থ সকল সৃষ্ট জীবের মধ্যে নিকৃষ্ট-জীব হইবে। তাহাদের মধ্যে হইতে ফেৎনা-ফাসাদ উঠিবে এবং তাহাদের মধ্যেই উহা ফিরিয়া যাইবে।" রসূল করীম (সাঃ) আল্লাহর নির্দেশেই সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী কখনও বৃথা হতে পারে না, হয়নি, হবেও না।

বাস্তবতার প্রেক্ষিতে এই যামানাই যে সেই যামানা অর্থাৎ হাদীসে উল্লেখিত যামানা তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। তাই এ যামানার আলেমদের আহবানে সাড়া দিতে সবাইকে খুব সাবধান হতে হবে। আল্লাহ্‌ আমাদের পথে পথে সহায় হউন। আমীন।

চলতি দুনিয়ার হালচাল

—মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

বুঝাতে পারলে জনগণ বুঝে ও সক্রিয় হয়

২০শে মার্চ ১৯৯৭ তারিখে প্রকাশিত ভোরের কাগজের পুরো সম্পাদকীয়টি নিম্নে দেয়া হলো:

যৌতুকের বিরুদ্ধে একটি গ্রাম

চর নিতাই ঝাড় গ্রামটি এখন জাতীয় পত্রিকার সংবাদ শিরোনাম হয়েছে। বাংলাদেশের হাজার হাজার গ্রামের মতো কুড়িগ্রামের এ গ্রামটিও একই রকম অবহেলিত ও পশ্চাদপদ। কিন্তু এই পশ্চাদপদতার মধ্যেই এ গ্রামের অধিবাসীরা একটি তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গ্রামের ৩১৭৮ জন বাসিন্দা একত্রিত হয়ে শপথ নিয়েছে, তারা বিয়েতে আর যৌতুক নেবে না এবং দেবেও না। সন্দেহ নেই, এটি একটি সাহসী সিদ্ধান্ত, একটি উচ্চতর মানবিক সিদ্ধান্ত। সামগ্রিকভাবে সমাজ ও পরিবারের প্রতি কোনো ব্যক্তি যখন পূর্ণমাত্রায় দায়িত্বশীল হয়ে ওঠে কেবল তখনই এ ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। আমরা চর নিতাই ঝাড় গ্রামের অশিক্ষিত অল্পশিক্ষিত লোকদের এমন শিক্ষিত সিদ্ধান্তের জন্য অভিনন্দন জানাই।

যৌতুক প্রথা আমাদের সমাজের এক মারাত্মক অভিশাপ। এক দুরারোগ্য ব্যাধির মতো তা সর্বব্যাপক হয়ে আমাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রাখছে। বাংলাদেশে নারী নির্যাতনের এক প্রধান উৎস এই যৌতুক। যৌতুকের কারণে বহু পরিবার অনাকাংক্ষিতভাবে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। বহু মেয়ের বিয়ে বিলম্বিত হয়, ভেঙে যায়। বহু মেয়ে বঞ্চিত হয় উপযুক্ত স্বামী থেকে। শুধু নারী সমাজের কল্যাণের দিক থেকেই নয়, সামগ্রিকভাবে সামাজিক কল্যাণের কথা ভাবলেও যৌতুক প্রথার অবসান খুবই জরুরি হয়ে উঠেছে। আমাদের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যও তা একান্তভাবে প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে চর নিতাই ঝাড় গ্রাম একটি অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। জনগণের ভেতর থেকে যদি এই প্রথার ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে উপলব্ধি না জাগে তাহলে তা দূর করা অসম্ভব বৈকি! এমনকি উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত কিংবা আইনের কঠোর বাস্তবায়নও আকাংক্ষিত ফল সৃষ্টিতে সহায়ক হবে না। চর নিতাই ঝাড় গ্রামের অধিবাসীদের সিদ্ধান্তকে তাই সবচেয়ে কার্যকর বলে আমরা মনে করি। এরূপ দৃষ্টান্ত অন্যত্র অনুসৃত হলে কার্যকরভাবে যৌতুক প্রথা বিলোপের দিকে আমরা এগিয়ে যেতে পারবো বলে আমরা আশা করি।

ভোরের কাগজে প্রকাশিত খবরের তথ্য থেকে জানা যায়, চর নিতাই ঝাড় গ্রামের লোকদের এমন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করেছে 'জীবিক', একটি এনজিও। একটি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে গ্রামবাসীদের শপথ পড়ান গ্রামের সবচেয়ে বৃদ্ধ লোকটি। অনুষ্ঠানে কুড়িগ্রাম জেলার অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট উপস্থিত ছিলেন। যৌতুক ছাড়া বিয়ে করেছে এমন এক দম্পতিকে ওই অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। পুরো ঘটনার মধ্যেই আমরা আশার আলো দেখতে পাই।

এই ঘটনার সূত্র ধরে দেশের বিভিন্ন সংগঠন 'যৌতুকমুক্ত গ্রাম' গঠনের এক জোরদার আন্দোলন গড়ে তুলতে পারে। সমাজ কাঠামোর ক্ষুদ্র ইউনিটগুলোকে যৌতুকমুক্ত করে বৃহত্তর ইউনিটগুলোকেও ক্রমান্বয়ে তার আওতায় আনা যেতে পারে। কাজটি কঠিন সন্দেহ নেই। কিন্তু সবাই হাত মেলালে—বিভিন্ন নারী সংগঠন, এনজিও, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং রাজনৈতিক দল ও সরকারি সহায়তা যদি পাওয়া যায় তাহলে কাজটি যে একেবারে অসম্ভব, তা-ও নয়।

এনিয়ে আরো অনেক পত্রিকায় অনুরূপ উৎসাহজনক মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। এতে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে বুঝাতে পারলে এদেশের গ্রামবাসীরা কি দ্বারা, কীভাবে তাদের তথা সমাজের কল্যাণ হয় তা তারা বেশ বুঝতে পারে। গঠনমূলক সিদ্ধান্ত নিতে ও কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণেও তারা এগিয়ে আসে।

চর নিতাই ঝাড় গ্রামের লোকদের এই সিদ্ধান্ত নেয়ার পেছনে রয়েছে 'জীবন বিকাশ কার্যক্রম' ('জীবিক') নামক একটি 'এনজিও'র উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়া। একটু গভীরভাবে বিবেচনা করলে দেখা যায় যে, যৌতুক-প্রথা জীবন বিকাশে [বিশেষতঃ নারীদের] বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অকালে অনেককে জীবন দিতে হচ্ছে, অনেকে এসিডদগ্ধ হয়ে দুর্বিসহ জীবন কাটাচ্ছে। দু'তিন যুগ আগেও যৌতুক-প্রথা হিন্দু সমাজে প্রচলিত ছিলো। এখন মুসলিম সমাজে ইহা ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করছে। এর কারণ হলো মোল্লা ভাইদের দায়িত্ব পালনে চরম ব্যর্থতা। নতুবা ইসলামের নামে অগণন সংস্থা, হাজার হাজার মাদ্রাসা, ২ লক্ষাধিক মসজিদ এবং শত শত পীর মাশায়েখ থাকা সত্ত্বেও যৌতুক-প্রথা তৌহীদি জনতার মাঝে শিকড় গাড়ে কি করে? আর তা দূর করার জন্য এনজিওদের এগিয়ে আসতে হয়েছে। যারা নিজেরা অবুঝ নির্বোধ তারা অন্যদের বোধশক্তি জাগাবে কি করে? যারা ধর্মান্ধ তারা অন্যদেরকে দেখাবে কি করে!!

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিম্নের উদ্ধৃত ভবিষ্যদ্বাণীতে এমন অবস্থার জবাব পাওয়া যাবে। আল্লাহ্‌র রসূল (সাঃ) বলেছেন:

"মানুষের উপর এমন এক সময় আসিবে, যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের

(অবশিষ্টাংশ ২১ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ইনকিলাবে হাকীকী

(প্রকৃত বিপ্লব)

[মূল: হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী, আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ)]

অনুবাদ: মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

(৩য় কিস্তি)

'ইনকিলাব' অর্থ:

যাইহোক 'ইনকিলাব' অর্থ হলো, প্রচলিত ব্যবস্থাকে সংশোধন বা পরিবর্তনের মাধ্যমে গ্রহণ করা যাবে না; বরং এ ব্যবস্থাকে সর্বতোভাবে নিক্ষেপ করে দেয়া হবে। আর এতদ্স্থলে একটি নতুন ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা হবে।

'ইনকিলাব'-এর অপর নামগুলো

যখন এই ইনকিলাব বা বিপ্লব ধর্মীয় কারণে হয় তখন ইসলামী পরিভাষা অনুযায়ী ইহাকে 'কিয়ামত' বা পুনরুত্থানও বলা হয়। আর এর অপর নাম 'খালকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরয' বা নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবীর সৃষ্টিও বুঝায়। আর ইহার অন্য একটি নাম 'আস্ সায়াত' বা নির্দিষ্ট সময়ও হয়। যেমন, কুরআন করীমে আধ্যাত্মিক বিপ্লবকে কিয়ামত বলা হয়েছে। কখনও আস্সাআত বা নির্দিষ্ট সময় হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। আর 'নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করা'র কথা বলে উহার প্রকৃত উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে।

দুনিয়াতে যত প্রকার পরিবর্তন সাধিত হয়েছে অথবা সফল আন্দোলনসমূহ সংঘটিত হয়েছে সব ঐ রঙ্গেই হয়েছে। কোন বিশ্ব-জোড়া আন্দোলন এবং দীর্ঘক্ষণ স্থায়ী আন্দোলন এমন নেই যার মধ্যে দুনিয়ার জন্যে নতুন আহ্বান নেই এবং যার মধ্যে বিপ্লব নেই।

বিবর্তনমূলক আন্দোলনসমূহ মহান আন্দোলন দ্বারা সংঘটিত হয় না। দুনিয়াতে যখনই মহান আন্দোলনসমূহ সাধিত হয়েছে বিপ্লবের মাধ্যমে হয়েছে আর যদি এ দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখা যায় তাহলে আমরা কংগ্রেসের চেয়েও অধিক জোরে-শোরে বলতে পারি যে, ইনকিলাব যিন্দাবাদ। কিন্তু এতদ্দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য অন্য রকম হবে। তাদের উদ্দেশ্য এতদ্দ্বারা অন্য রকম হয়ে থাকে।

পার্থিব পাঁচটি মহান আন্দোলন

যদি দুনিয়ার বিজয়ের প্রতি দৃষ্টি দেয়া যায় তাহলে পার্থিব বিজয়ের দিক থেকেও ঐ সরকার দুনিয়াতে দীর্ঘ কাল যাবৎ স্থায়ী রয়েছে আর তার প্রভাব ব্যাপকতর হয়েছে যার মধ্যে কোন না কোন নব আহ্বান ও বিপ্লব নিহিত ছিলো। অর্থাৎ পূর্বতন ব্যবস্থাপনা থেকে ভিন্নতর সত্তার অধিকারী ছিলো। এ রকম আন্দোলন পৃথিবীতে মাত্র কয়েকটিই অতীত

হয়ে গেছে। যেমন, এদের মধ্যে একটি আন্দোলন যা হিন্দুস্থানে উত্থিত হয়েছিলো তাকে আর্য সভ্যতা বলে। অর্থাৎ আর্যদের অভ্যুত্থান। এ আন্দোলন কেবল হিন্দুস্থানের মধ্যেই সীমা-বদ্ধ ছিলো। অপর একটি আন্দোলন যা পাশ্চাত্যে উত্থিত হয়েছিলো তা হলো রোমান সভ্যতা। তৃতীয় আন্দোলন যা মধ্য এশিয়া ও চীনে জন্ম নিয়েছিলো উহার নাম আমি পারশ্য সভ্যতা রাখলাম। চতুর্থ আন্দোলন যা পশ্চিম এশিয়া ও আফ্রিকায় জন্ম নিয়েছিলো উহার নাম আমি বেবিলনীয় সভ্যতা রাখলাম। আর পঞ্চম আন্দোলন যা কিনা বর্তমান যুগে বিশ্বব্যাপী প্রসার লাভ করেছে তা হলো পাশ্চাত্য সভ্যতা।

বিশ্বের জ্ঞাত ঐতিহাসিক যুগের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে জানা যায় যে, এই পাঁচটি আন্দোলন বা সভ্যতা বস্তুবাদের প্রতি দৃষ্টি রেখে খুবই শান ও মর্যাদা এবং আন্তর্জাতিক সভ্যতা হিসেবে অতীত হয়ে গেছে। অর্থাৎ আর্য সভ্যতা, রোমান সভ্যতা, পারশ্য সভ্যতা বেবিলনীয় সভ্যতা এবং পাশ্চাত্য সভ্যতা। এ পাঁচটি সভ্যতার পিছনেই এক নতুন দর্শন কার্যকরী ছিলো। আর ছিলো নতুন সংস্কৃতি। কেবল ইহাই নহে যে, কতক জাতি তরবারী ধারণ করলো আর কয়েকটি দেশ বিজয় করে ফেল্ল বরং ঐ সমস্ত আন্দোলন বা সভ্যতার হোতারা তাদের পূর্ববর্তী ব্যবস্থাপনাকে লণ্ডভণ্ড করে দিলো এবং তদস্থলে একটি নব-সভ্যতার ভিত্তি স্থাপন করলো বা নব-জ্ঞানের অর্গল উন্মোচন করলো। আর যদিও ঐসব নব-সভ্যতার ধারক ও বাহকরা কিছু দিনের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে শাসন ক্ষমতাকে হাড়িয়ে ফেল্ল এবং তাদের জায়গায় অন্যান্য জাতিবর্গ আবির্ভূত হলো; কিন্তু তাদেরকে পরাভূতকারী ও ধ্বংসকারী জাতির লোকেরা তাদের ধ্যান-ধারণা এ দর্শনাদি থেকে মুক্তি পেতে পারলো না। রাজনৈতিক দাসত্ব দূরীভূত হতে থাকলো কিন্তু মেধাগত ও জ্ঞান-বুদ্ধিগত দাসত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকলো। আর প্রকৃতপক্ষে আসল কর্তৃত্ব তাদের হাতেই রয়ে গেলো। এবং এরূপ বিজয় ও সফলতাকে নব-আহ্বান বা বিপ্লব নামে আখ্যায়িত করা যায়। বাহ্যতঃ এরিয়ান বা আর্য সভ্যতা এবং প্রাচীন ইরানী বা পারশ্য সভ্যতা, রোমান ও ব্যবিলনীয় কর্তৃত্ব কিছু-কালের মধ্যেই দুনিয়া থেকে মিটে গেল। কিন্তু প্রকৃত কথা এই যে, উহাদের মধ্য থেকে কতক কোন না কোন রঙ্গে এখনও পর্যন্ত দুনিয়াতে মজুদ আছে। আর বাহ্যতঃ উহাদের সাথে ঘৃণা ভাব পোষণকারী লোকও প্রকৃতপক্ষে তাদের দাসত্বের শৃংঙ্খল স্কন্ধে ধারণ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবং তাদের পরে আগমনকারী শাসকরাও প্রকৃতপক্ষে তাদের কর্ম-কাণ্ডকে পরিবর্তন করার একটি বাহ্যিক মহড়া দেখালেন মাত্র। নচেৎ সরকারী নীতি নির্ধারক তারাই ছিলেন যারা ঐ বিখ্যাত সভ্যতার প্রবক্তা ছিলেন। বিদ্রোহ ছিলো ঐ সভ্যতা সংস্কৃতির শেষ যুগের নেতার বিরুদ্ধে, ঐ সভ্যতা সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ছিলো না। পরিবর্তন কেবল ইহাই ছিলো যে, ঐ সভ্যতা-সংস্কৃতিতে পতাকা এক হাত থেকে অন্য হাতে পরিবর্তিত হলো। কখনও কখনও পতাকার রং সামান্য পরিবর্তন করে দেয়া হলো। কখনও পতাকাকে অধিক লম্বা বা খাটো করে দেয়া হলো। কিন্তু আসল বস্তু উহাই থাকলো যা পূর্বে ছিলো।

পাশ্চাত্যে রোমান সাম্রাজ্যের পরে যে পরিবর্তন সাধিত হলো, যদি লক্ষ্য করে দেখা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, উহা রোমান সভ্যতারই একটি পরিবর্তিত রূপ। এবং পারশ্য সভ্যতার প্রবক্তাদের পরের সরকারের মধ্যে সুস্পষ্টভাবে প্রাথমিক পারশ্য সভ্যতার ঝল্‌ক পরিবর্তীত হয়। আর্য সভ্যতার প্রবক্তাদের পরে বুদ্ধ, জৈন প্রভৃতি কয়েক প্রকারের লোক শাসন কার্য পরিচালনা করে। কিন্তু আর্য সীল মোহর সকলের আঁচলের ওপরে বিরাজমান ছিলো। বেবিলনের শাসকদের পরে আরব, সিরিয়া, মিশর প্রভৃতি দেশে বহু শাসকের পরিবর্তন হয়েছে। কত বিদ্রোহ হয়েছে। কিন্তু বেবিলনীয় প্রভাব না মুছে যাওয়ার ছিলো না মিটে ছিলো।

এখন পাশ্চাত্য সভ্যতা সারা দুনিয়ার ওপরে ছেয়ে আছে। এশিয়া এবং আফ্রিকা উহার প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করছে। এর আগে আমেরিকার উভয় মহাদেশ সফলকাম চেষ্টা করেছে। জাপান এশিয়ার এক প্রান্তে আর তুর্কিস্তান অপর প্রান্তে সফলতার সাথে চেষ্টা করেছে। কিন্তু ফল কি দাঁড়ালো? কেবল শাসক বদলিয়েছে শাসন বদলায় নি। বরং তুর্কিস্তান ও জাপান স্বাধীনতার পরে আগে থেকেও পাশ্চাত্যের অধিক শিকার হয়েছে।

আজ হিন্দুস্তান স্বাধীনতার জন্যে আন্দোলন করছে। এর যুবকবৃন্দ প্রাণকে হাতের মুঠোয় নিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে যেন নিজেদের দেশকে বিদেশী শাসকদের কবল থেকে মুক্ত করতে পারে। কিন্তু তাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও সংগ্রাম ঐ সীমা পর্যন্ত আবদ্ধ যেন ইংল্যাণ্ডের পাশ্চাত্য সভ্যতার স্থলে ভারতীয় পাশ্চাত্য সভ্যতা স্থান করে নেয়। এথেকে অধিক এ সংগ্রামের কোন উদ্দেশ্য নেই। মিঃ গান্ধি খদ্দরের পোষাক পরিধান করে ঐ বিষয়কে প্রকাশ করতে চেয়েছেন, যেন তিনি ঐ সভ্যতার কবল থেকে মুক্তি পেতে চান। কিন্তু যারা জানার তারা সঠিকভাবে জানেন যে, ঢং উহাই কেবল স্কটল্যাণ্ডের ওয়ার ষ্টেড (এক প্রকার উন্নত মানের উলের কাপড়)-এর স্থলে তাকে খদ্দরের পোষাক পরিধান করিয়ে দিয়ে গেছে। অথবা মসীহ নাসেরী (আঃ)-এর কথামত পুরাতন মদ নতুন কলসীতে ঢেলে দিয়ে গেছে। এথেকে অধিক আর কোন পরিবর্তন হয় নি।

এখন আমি এ পাঁচটি সভ্যতার বিস্তারিত বিবরণ পেশ করছি যেন লোকেরা বুঝে যায় যে, এ পাঁচটি সভ্যতার প্রবাহ বিশ্বের জন্যে কী বাণী বহন করে নিয়ে এসেছিলো। আর কী কল্যাণমণ্ডিত জিনিষ তারা বিশ্বকে উপহার দিয়েছিলো যাথেকে তারা হাজার হাজার বছরের সংগ্রামের পরেও মুক্তি লাভ করতে পারে নি।

(১) আর্য সভ্যতার বাণী—'বর্ণগত বৈশিষ্ট্য'

স্মরণ রাখা দরকার যে, আর্য সভ্যতার ভিত্তি Eugenic (সুপ্রজনন সংক্রান্ত)-এর

ওপরে প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ তাদের সব কিছুর ভিত্তি এ কথার ওপরে রচিত ছিলো যে, সব মানুষ এক নয়। বরং মানুষে মানুষে ভেদাভেদ রয়েছে। কেউ উঁচু হয় তো কেউ আবার নীচু। যেভাবে কেউ ধনী হলে কেউবা হয় গরীব। কেউ শক্তিশালী হলে কেউ হয় দুর্বল। কেউ উত্তম মেধার অধিকারী হলে কেউ কম মেধার অধিকারী হয়ে থাকে। আর ইহাও যে, এ ভেদাভেদকে বিশেষ অবস্থার মাধ্যমে স্থায়ী করা যেতে পারে। এবং বিশ্বের কল্যাণ এর মধ্যেই নিহিত যে, মানুষের মধ্যে যে সবচে' উচ্চ-উন্নত তাকে সম্মুখে নিয়ে আস যেন মানুষের প্রজন্ম উন্নতির শীর্ষে পৌঁছে যেতে পারে।

তারা একথা বলেন যে, একজন শক্তিমান পিতার পুত্র অবশ্যই শক্তিশালী হবে। আর দুর্বল পিতার সন্তান দুর্বল হবে। এখন যদি পিতার কারণে সুঠাম দেহ সৃষ্টি হতে পারে তাহলে এমন কি কারণ আছে যে, মেধা উন্নত সৃষ্টি হবে না? তাই যদি উত্তম মেধাসম্পন্ন পিতা হয় এবং উত্তমমেধাসম্পন্ন মাতা হয় তাহলে তাদের সন্তানও অবশ্যিই উত্তম মেধাসম্পন্ন হবে। এ অবস্থায় যদি ঐ ব্যক্তির মাধ্যমে প্রজন্ম সৃষ্টি হতে থাকে আর তারা নিজেদের জাতির মধ্যেই বিয়ে-সাদী করতে থাকে তাহলে ঐ জাতি অন্যান্য জাতি থেকে অবশ্যই উন্নত হবে।

এই আর্য সভ্যতা যেখানেই বিস্তার লাভ করেছে তারা নিজেদের শাসন ব্যবস্থা ঐ ভিত্তির ওপরই প্রতিষ্ঠা করেছে। অর্থাৎ ঐ বর্ণগত বৈশিষ্ট্যের ওপরে যা কিনা বুদ্ধিভিত্তিক মেধাভিত্তিক ও ধর্মভিত্তিক সীমাসমূহের দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিলো। যেমন, তারা বলে, ব্রাহ্মণের ছেলে জ্ঞানের দিক থেকে সর্বদা অন্যদের ওপরে বুৎপত্তি রাখবে। একজন ক্ষত্রিয়ের ছেলে যুদ্ধ বিদ্যার দিক থেকে অন্যদের ওপরে পারদর্শিতা লাভ করবে। আর যখন একটি জাতির বর্ণগত বৈশিষ্ট্যের কারণে উন্নতি লাভ হবে তখন তারা নিজেদের মধ্যেই বিয়ে-সাদী করবে। এমতাবস্থায় ঐ জাতি কখনও দুনিয়া থেকে বিনাশপ্রাপ্ত হতে পারে না। এজন্যে তাদের ধর্মও ঐ আন্দোলনের মাধ্যমে প্রবাহমান থাকে। যেমন, বেদ অবতীর্ণ হল, বেদের মধ্যে এ আদেশ প্রদান করা হয়েছে যে, যদি শূদ্র বেদ শুনেও ফেলে তাহলে তার কানের মধ্যে শিসা গলিয়ে ঢেলে দাও। ইহা (পাঠ করা ও শুনা) ব্রাহ্মণের অধিকার। অথবা ক্ষৈত্রিয় ও বৈশ্যদের অধিকার যে, তারা বেদ শ্রবণ করে। শূদ্রদের কী অধিকার যে, তারা বেদ শ্রবণ করে? মোট কথা ধর্মও এ আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছে।

আবার এই যে তারা বলে, মরণের পরে মানুষ পুনরায় এ পৃথিবীতে ফিরে আসে এবং তাকে বিভিন্ন যোনীতে নিক্ষেপ করা হয়। যতটা আমি অভিনিবেশ সহকারে দেখেছি তাতে আমি মনে করি যে, এই ধর্মীয় বিশ্বাসও ঐ দর্শনের ফলস্বরূপ। কেননা, তারা মনে করে যে, উন্নত মানের প্রজন্ম সৃষ্টি করার জন্যে ইহা প্রয়োজনীয় যে, উন্নতমানের আত্মা

এর মধ্যে সংযোজিত হতে থাকুক। আর উহার জন্যে এই পদ্ধতি তারা প্রস্তাব করেছে যে, প্রত্যেক জাতির মধ্যে যে উন্নত ও পবিত্র আত্মাগুলো রয়েছে মরণের পরে ওগুলো ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নেয়। এবং যারা যোদ্ধাসুলভ শক্তি রাখে তারা ক্ষত্রিয়ের ঘরে আর যারা ব্যবসায়ীসুলভ দক্ষতা রাখে তারা বৈশ্যদের ঘরে জন্ম নেয়। এ বিশ্বাস দ্বারা তারা নিম্ন বর্ণের লোকদের বিদ্রোহের অবকাশকে দূরীভূত করে দিয়েছে। কেননা, যদি শূদ্রদের ইহা বলা হয় যে, তোমরা সর্বকালের জন্যে শূদ্রই থাকবে তাহলে তাদের বিদ্রোহ করার সম্ভাবনা থাকতো। অথবা যদি ক্ষত্রিয়দের বলা হতো যে, তোমাদের কাজ কেবল প্রাণ বিসর্জন দেয়া তাহলে তারা ব্রাহ্মণ-শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যেত। সুতরাং এই ধর্মীয় বিশ্বাসের দ্বারা তাদেরকে স্তব্ধ করানো হয়েছে যেন তারা ব্রাহ্মণদের প্রাধান্যকে ঠাণ্ডা মস্তিষ্কে স্বীকার করে নেয়। কেননা, তাদেরকে এ নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে যে, প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্য অথবা শূদ্র একই বংশ থেকে উদ্ভব নয়। বরং এগুলো তো পদ-মর্যাদা যা কিনা উত্তম বা নিকৃষ্ট আত্মা হওয়ার কারণে লাভ হয়ে থাকে। এখন যেভাবে এক জমাদারের এক রিসালদারের বিরুদ্ধে, এক রিসালদারের এক লেফটেন্যান্টের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকতে পারে না। কেননা, তারা অবহিত দক্ষতার কারণে তাদের এ পদ লাভ হয়েছে এবং যখন আমি এ দক্ষতা অর্জন করতে পারবো তখন আমারও এ পদ লাভ হবে। এভাবে এক শূদ্রকে বৈশ্যের, এক বৈশ্যকে এক ক্ষৈত্রিয়ের এবং এক ক্ষৈত্রিয়কে ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকতে পারে না। কেননা, এ জন্ম তো বিগত জন্মের কর্মের প্রতিফলে পাওয়া গেছে। যদি একজন শূদ্র সৎকর্ম করে তাহলে পরজন্মে সে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম লাভ করবে এবং অসৎ ব্রাহ্মণ শূদ্রের ঘরে জন্ম নিবে।

এমনিভাবে প্রাধান্যকে চিরস্থায়ী রেখেও আর্য সভ্যতার প্রবক্তাগণ এ প্রাধান্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের সম্ভাবনাকে মিটিয়ে দিয়েছে। আর আশার কুহক অন্য সম্প্রদায়ের মধ্যে এমনভাবে সৃষ্টি করে দেয়া হয়েছে যেন তারা এ খেলনা নিয়ে খেলায় মশগুল থাকে এবং তাদের সত্যিকারের দুঃখ-বেদনাকে একেবারে ভুলে যায়। এই কারণেই বর্ণ ভেদের নির্মম নিষ্পেষণ চরম পর্যায়ে বৃদ্ধি পাওয়ার পরও হাজার হাজার বছর ধরে নিম্ন শ্রেণীর জাতিগুলো তাদের অবস্থার ওপরে সন্তুষ্ট। কেননা, প্রত্যেক শূদ্রের দৃষ্টিতে পুনর্জন্ম তার প্রজন্মের হেয়তার যুগ কেবল উহার বর্তমান জন্মের যুগের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে এবং প্রত্যেক শূদ্র যার প্রাণে বর্তমান ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধারণা সৃষ্টি হলে এ ধারণা করে চুপ হয়ে যায় যে, আমি এ জন্মে আমার পাপের কারণে এসেছি অন্যথায় এর আগে আমিও হয়ত ব্রাহ্মণই ছিলাম। আর এখনও ব্রাহ্মণদের খুশী করে সম্ভবতঃ পরজন্মে আমিও ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিবো। অতএব যে মর্যাদা লাভের হাতছানি আমাকে ডাকছে আমি নিজের হাতে ঐ মর্যাদা হানি ঘটিয়ে কেন ভবিষ্যত উন্নতির সম্ভাবনাকে নস্যাৎ করে দেব?

আসল কথা এই যে, বর্ণগত প্রাধান্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখার জন্যে পুনর্জন্মের মসলা বা ধ্যান-ধারণার উদ্ভব এক উন্নত মেধার বিস্ময়কর ফসল। আর যদি এর কারণে কোটি কোটি মানব-সন্তানকে হাজার হাজার বছর ধরে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে দেয়া না হতো তাহলে নিশ্চয় ইহাকে বাহ্‌বা দেয়া যেত! (চলবে)

পত্র-পত্রিকা থেকে

আহমদীয়া জামাতের উদ্যোগে সিরাতুন্নবী (সাঃ) উদযাপিত

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রামের উদ্যোগে গত শুক্রবার যথাযথ ভাবগম্ভীর পরিবেশে ইসলামী ঐতিহ্য অনুসারে স্থানীয় আমির মোবাশ্বেরুর রহমান এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমীর আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, ইসলাম মানেই শান্তি, আইয়ামে জাহেলিয়াতের যুগে হানাহানিতে লিপ্ত আরবদের সেই শান্তির সুধা পান করিয়ে ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে একত্রিত করেছিলেন মুহাম্মদ মুস্তফা (সাঃ)। তাই হানাহানি নয়, ভালবাসা ও শান্তির মাধ্যমেই ইসলাম তথা বিশ্ব নবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) নির্দেশিত পথ অনুসরণ সম্ভব।

উক্ত আলোচনা সভায় আরও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষক মাওলানা আব্দুল আওয়াল খান চৌং ও মাওলানা এমদাদুর রহমান সিদ্দিকী। খবর প্রেস বিজ্ঞপ্তির। (২১/৭/৯৭ইং তারিখের দৈনিক আজাদী, চট্টগ্রাম এর সৌজন্যে)

…আহমদিয়া মুসলিম জামাত চট্টগ্রাম পবিত্র মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে মোবাশ্বেরুর রহমানের সভাপতিত্বে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুসলিম জামাতের বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমির আলহাজ্ব মীর মোহাম্মদ আলী। এতে মাওলানা আব্দুল আওয়াল খান চৌধুরী ও মাওলানা এমদাদুর রহমান সিদ্দিকী বক্তব্য রাখেন…।

(২০/৭/৯৭ ইং তারিখের দৈনিক ঈশান-চট্টগ্রাম এর সৌজন্যে)

খতিব সরকার বনাম বাংলাদেশ সরকার

মুনতাসীর মামুন

বিষয়টি এখনও আলোচিত এবং আলোচিত হবে যতদিন এর একটা সুনিষ্পত্তি না হয়। কে রাজত্ব করবে বাংলাদেশে—খতিব সরকার না বাংলাদেশ সরকার? বিষয়টিকে এখন এভাবেও দেখা যেতে পারে। যে খতিব মানিক মিয়া এ্যাভিনিউতে প্রকাশ্য বলেন, 'গাদ্দার'রা পাকিস্তান ভেঙ্গেছে তারপরও তিনি খতিব থেকে যান বায়তুল মোকাররমে বহাল তবিয়তে, খালেদা জিয়ার আমলে, শেখ হাসিনার আমলেও। তাঁর পক্ষে রাস্তা দাপিয়ে বেড়ান চরের পীর, ঐক্যজোটের অদ্ভুত উপাধিকারী ব্যক্তি। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দাবিদার আওয়ামী লীগ প্রতিবাদ করে না সরকার নিশ্চুপ। এতদিন এই ছিল অবস্থা। আমরা গুটিকয় ব্যক্তি রাস্তায় হৈচৈ করি। ক্ষমতাসীনরা (যখন যে থাকে) আমাদের করুণার দৃষ্টিতে দেখে। আজ এতদিন পর রাষ্ট্রপতি ও ধর্মপ্রতিমন্ত্রীকে পাদুকা প্রদর্শনের পর সরকারী ও দলীয়

নেতৃবৃন্দ বুঝলেন, তাঁদের অপমান করা হয়েছে। আওয়ামী লীগ অনুধাবন করল, তাদের তাচ্ছিল্য করা হয়েছে, লোকজন তাদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করছে।

এ কারণেই পাদুকা প্রদর্শনের পর আওয়ামী লীগ জনসভা করে। মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক ঘোষণা করেন, "ওদের মুখোশ খুলে দিন। এই খতিব মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছে। তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে।" (দৈঃ বাংলাবাজার, ২৩, ৭)। আমরা এদের মুখোশ যথাসাধ্য উন্মোচন করেছি। আপনারা কি করেছেন? কি ব্যবস্থা নিবেন সেটা বলুন।

ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বলছেন, তারা 'নবীকে অপমান করেছে। বায়তুল মোকাররম আজ ইহুদীদের কবলে, মুক্ত করতে হবে।" (ঐ)। না, এটি ভুল। মসজিদ ইহুদীদের কবলে নয়, পাকিপন্থী ধর্ম ব্যবসায়ীদের কবলে। তিনি আরও বলেছেন, "১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে উবায়দুল হকের ভূমিকা ছিল পাকিস্তানের পক্ষে এটা সবার জানা। আমরা মুক্তিযুদ্ধের সাথে ছিলাম। পাকিস্তানপন্থী হয়ে উনি মুক্তিযুদ্ধাদের দেখতে পারবেন না এটাইতো স্বাবাবিক।" (সংবাদ, ২৫,৭)। ধর্ম প্রতিমন্ত্রী এতকিছু জেনে এতদিন কেন নিশ্চুপ ছিলেন? আজইবা কেন উত্তেজিত?

ধর্ম ব্যবসায়ীদের এই দৌরাত্ম্য গত ৫/৬ বছর ধরে চলছে, এখন যা তুঙ্গে। বিএনপি এখন ধর্ম ব্যবসায়ীদের বি-টিম হিসাবে কাজ করছে। তাদের বর্তমান ষ্ট্যাটেজি যে কোন মূল্যে বিশৃঙ্খলার চেষ্টা করা এবং ইসলামী ঐক্যজোটের ভাষায় আওয়ামী লীগের 'তখত তাউস গুড়িয়ে' দেয়া। সরকারের কাছে প্রশ্ন কবি শামসুর রাহমান, অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, সাংবাদিক কাজী শাহেদ আহমদ বা অধ্যাপক আলী আসগরকে যখন 'মুরতাদ' ঘোষণা করা হয় তখন ধর্মপ্রতিমন্ত্রী একটি বাক্যও কেন উচ্চারণ করলেন না? বা আওয়ামী লীগ? তাঁরাতো মন্ত্রীসভার সদস্য বা কোন রাজনীতিবিদের চেয়ে কম পরিচিত নন। শুধু তাই নয় এ সরকারকে ক্ষমতায় আনার জন্য বা স্বৈরাচারবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে এঁদের ভূমিকাতো কম নয়। এটি এক ধরনের ডবল ষ্ট্যাণ্ডার্ড। সরকার বলুক, আইনত কাউকে কি মুরতাদ ঘোষণা করা যায়? বা কারও 'কল্লার' জন্য এক লাখ টাকা পুরস্কার? যদি কেউ তা না পারে তাহলে আইনত তারা দণ্ডনীয় কিনা? এবং দণ্ডনীয় হলে সরকার এ পরিপ্রেক্ষিতে কি ব্যবস্থা নিয়েছে? এক্ষেত্রে তাঁরা নিশ্চুপ কেন? এ কথা বললাম এ কারণে যে, অবসর গ্রহণের পর অনেকে মানবাধিকার ও বিচার বিষয়ে আমাদের হেদায়েত করেন।

পবিত্র কোরান শরীফে সুরা নিসায় বলা হয়েছে—"অবশ্য তোমরা কিছু লোক পাবে যারা তোমাদের কাছে ও তাদের সম্প্রদায়ের কাছে বিশ্বাস অর্জন করতে চায়। যখনই তাদের ফিৎনায় ফিরান হয় তখনই তারা উল্টিয়ে যায়। যদি তারা তোমাদের কাছে থেকে চলে যায়, তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব না করে ও তাদের হাত না সামলায় তবে তাদের যেখানেই পাবে পাকড়াও করবে···'আর আমি তোমাদের এইসব প্রতিরোধের স্পষ্ট অনুমতি দিয়েছি।"

আমরা এ পবিত্র সুরায় সান্তনা পাই। তবে, আওয়ামী লীগ এদের প্রতিরোধের জন্য জনসভা করে এবং নেতৃবৃন্দ আহ্বান জানিয়ে বলেন, রাজাকারমুক্ত করার জন্য শুক্রবার বায়তুল মোকাররমে জুমা আদায় করতে হবে। এ আহবান অনেককে উদ্দীপ্ত করে যদিও মসজিদে নামায পড়ে তা রাজাকার মুক্ত করা যায় না। রাজাকারমুক্ত করতে হলে ইসলামী ফাউণ্ডেশনের কর্তৃত্ব পাল্টাতে হবে। তবুও অনেকে গিয়েছিলেন, কিন্তু নেতারা কেউ যাননি। প্রায় প্রতিটি পত্রিকা এ খবর দিয়েছে। একমাত্র ফিৎনা সৃষ্টিকারী দৈনিক ইনকিলাব লিখেছে—"গতকাল (শুক্রবার) বায়তুল মোকাররম মসজিদে জাতীয় সংসদের ত্রিশজন সদস্য একত্রে জুমার নামায আদায় করেছেন। ইতিপূর্বে বায়তুল মোকাররম মসজিদে সরকারী দল ও বিরোধী দলের এত এমপি'কে একসাথে দেখা যায়নি। তবে এমপি তালিকায় সরকারী দলের প্রাধান্য ছিল। .....আওয়ামী লীগের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী স্বতঃস্ফূর্তভাবে এ নামাজে অংশ নেয়। এছাড়াও সিটি মেয়র মোহাম্মদ হানিফ জুমার নামাজে অংশ নেন।"

অন্য দিকে আজকের কাগজ খবর দিয়েছে, সংঘর্ষ হতে পারে এ আশঙ্কায় "পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অঘোষিতভাবে নিষ্ক্রিয়" রাখা হয়। মেয়র হানিফ বলেন, "আমি বায়তুল মোকাররমে যাইনি।" তাহলে এখন বিএনপি, জামাত, ইসলামী ঐক্যজোটের মুখপত্র 'ইনকিলাব'কে কি অভিধায় ভূষিত করবেন? শোনা যায় এ পত্রিকায় এখনও সরকারী দলের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তির কোম্পানির বিজ্ঞাপন নিয়মিত যায়।

এই হচ্ছে আমাদের সমাজের উচ্চ বর্গের ডবল ষ্ট্যাণ্ডার্ড আর এ কারণেই ধর্ম ব্যবসায়ীরা রাষ্ট্রপতিকে পাদুকা প্রদর্শনের শক্তি পায়। তা ছাড়া সংঘর্ষ এড়াবার কৌশল কি কাজে লেগেছে? যে সব আওয়ামী কর্মী সরল বিশ্বাসে নেতাদের ডাকে কর্মসূচী পালন করতে প্রস্তুত হয়েছেন, নেতারা কি তাদের দায়-দায়িত্ব নিয়েছেন? নেননি। দুঃখটা এখানে। কর্মীদের তো ব্যবহার করতে করতে পাদুকা করে ফেলা হয়েছে।

ধর্মপ্রাণ বাঙালীর কাছে প্রশ্ন—ধর্ম অশান্তি সৃষ্টিতে অপব্যবহৃত হলে কি মানুষের শ্রদ্ধা ভালবাসা বাড়বে? এবং একদল মানুষ ও তাদের নেতারা যদি নিয়ত তাই করে, সত্য বিকৃত করে তাদের কি ধর্মাশ্রয়ী বলবেন? একটি উদাহরণ দেই। যেই খতিবকে অনেকে বড় করে দেখছেন সেই খতিব দৈনিক বাংলাবাজারের সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, "১৯৮৪ সালে তিনি এই পদে যোগ দেন এবং সরকার তাঁকে নিয়োগ দেয়—" 'এটি একটি অনারারি পদ। সরকারী নিয়মিত চাকুরের মত নয়। সাধারণ চাকুরেদের সুযোগ এক্ষেত্রে নেই।' অথচ পত্র-পত্রিকার তার উল্টোটা লেখা হয়েছে এবং ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বলছেন খতিব "ফাউণ্ডেশনে বেতনভুক্ত কর্মচারী"। ঈদ-ই-মিলাদুন্নবীর হাঙ্গামা সৃষ্টি সম্পর্কে 'ইনকিলাব' বাদে সব পত্রিকার ভার্সান এক যাতে ইঙ্গিত করা হয়েছে হাঙ্গামার জন্য খতিব দায়ী। খতিব বলছেন,

"এসব বিলকুল ঝুট।" তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল—

"১৫ জুলাই রসূল (দঃ) ও পবিত্র কোরআনের অবমাননার প্রতিবাদে হরতাল হয়েছিল। এই হরতাল নিয়ে আপনার মূল্যায়ন ?"

জবাব: আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ইসলামের দুশমনেরা কোন ক্ষেত্রে ইসলামের অবমাননা করলে এর বিরুদ্ধে 'নারাজি' প্রকাশের বিভিন্ন উপায় রয়েছে। 'নারাজি' প্রকাশের অন্যতম উপায় হল হরতাল। বিভিন্ন আনুসঙ্গিক কারণে এই হরতাল করাটা আমি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করি না।" যদি না-ই করেন তাহলে খতিব হিসাবে তিনি কেন হরতালের বিরুদ্ধে আহবান জানালেন না, যেখানে তিনি কাদিয়ানীদের বিরুদ্ধে জনসভা করতে পারেন ? মুক্তিযোদ্ধাদের 'গাদ্দার' বলতে পারেন ? আপনারা যাঁরা ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি তাঁরাই বিচার করে বলুন এই জনাবকে কি আর খতিব পদে রাখা যায়—যার কথা আর কাজে বিরাট ফারাক ? আর বায়তুল মোকাররম হওয়ার পর কোন খতিব নিয়ে এত বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়নি, যা এখন হচ্ছে। এর কারণই বা কি ?

এই হরতাল সম্পর্কে ফজলুল বারী কায়রো থেকে জনকণ্ঠে লিখেছেন—"বিশ্ব ইসলামী সম্মেলনে আসা নেতৃবৃন্দ ঈদ-ই-মিলাদুন্নবী প্রস্তুতির সময় বাংলাদেশে হরতাল হচ্ছে শুনে অবাক হলেন।" তাঁরা এখানকার ইসলামী নেতাদের জানেন না দেখে অবাক হয়েছেন। সাংবাদিক সন্তোষ গুপ্ত যথার্থই লিখেছেন, "ধর্মকে এরা ইহুদীবাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার না করে আওয়ামী লীগকে বেকায়াদায় ফেলার জন্য করেছে। পৃথিবীর অন্য কোন মুসলিম দেশ মহানবী ও কোরান শরীফের অবমাননার জন্য হরতাল ডাকে নি।" বর্তমানে ধর্ম ব্যবসায়ীদের বি-টিম হিসাবে পরিচিত বিএনপি ঘোষণা করেছে—"সর্বস্তরে এই সরকারের নগ্ন দলীয়করণের অভ্যাস হিসাবে পবিত্র ধর্মীয় অনুষ্ঠানেও ধর্ম প্রতিমন্ত্রী এবং সচিব দলীয় বক্তব্য প্রদান করে যে উস্কানিমূলক আচরণ করেছেন তাও নিন্দনীয়।" তাঁরা কি উস্কানীমূলক বক্তব্য রেখেছেন ? আর বর্তমান ধর্ম সচিবের চাকরিতো প্রায় চলে গিয়েছিল ১৯৭৩/৭৪ সালে। বিনপি ভুলে গেছে বর্তমান খতিবও তাঁদের বিপদে ফেলেছিলেন। ধর্ম ব্যবসায়ীদের পক্ষাবলম্বন কখনও কাউকে সুবিধা দিয়েছে বলে জানা যায়নি।

অবশ্য সুরা আনয়ামে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন "অবশ্য যারা ধর্ম সম্বন্ধে নানা মতের সৃষ্টি করেছে ও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে তাদের কোন কাজের দায়িত্ব তোমার নেই, তাদের বিষয় আল্লাহর এখতিয়ারভুক্ত। আল্লাহ তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে তাদের জানিয়ে দিবেন।"

বর্তমান ফিৎনায় এই সুরাই আমাদের সান্ত্বনা দিতে পারে। এ উদ্ধৃতি দিলাম এ কারণে যে, ইসলামী ঐক্যজোট ঘোষণা দিয়েছে—"আমাদের কথামতো রাষ্ট্র চলবে। কারণ, সংখ্যায় আমরা ১১ কোটি মুসলমান। ইসলামী ফাউণ্ডেশনকে আওয়ামী ফাউণ্ডেশন বানানোর

চক্রান্ত প্রতিহত করা হবে।" (বাংলাবাজার পত্রিকা, ২৬-৭)।

ইতোমধ্যে তারা ২৩ আগষ্ট আবার শিখা চিরন্তনের বিরুদ্ধে মহাসম্মেলন আহ্বান করেছে আর খতিব ঘোষণা করেছেন "কাদিয়ানীদের অমুসলিম ঘোষণা করার দাবীতে আগামী ১৪ নবেম্বর মানিক মিয়া এ্যাভিনিউতে মহা সম্মেলন আহ্বান করা হবে।"

গত শুক্রবার ইসলামী ঐক্যজোটের সভায় জনাব মুহিউদ্দিন খান ঘোষণা করেছেন—"বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের মিম্বরে কে বসবেন—তা আল্লাহই নির্ধারণ করে দিয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও দেবেন। এ মিম্বরে মওলানা ওবাইদুল হকই বসবেন।" ভাষাটা দেখুন, যেন আল্লাহ-ই তাঁকে খবরটি দিয়েছেন। ওয়াসতা গফিরুল্লাহ!

সরকারকে পাদুকা প্রদর্শনের পর এ ধরনের হুমকি ধর্ম ব্যবসায়ীরা দিতে পেরেছে যেহেতু আওয়ামী লীগ কর্মসূচী দিয়ে নিষ্ক্রিয় থেকেছে। এবং সরকারের ব্যবহারে সবসময় দোদুল্যমানতা প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং তারা সৃষ্টি করেছে সমান্তরাল সরকারের। যদি তা না-ই হয় তাহলে এতকিছুর পর খতিব বলছেন—'আমি জোর করে থাকতে চাই না। মসজিদের মুসল্লিরা চাইলে আমি অপসারণ মেনে নেব। কিন্তু আমার জবাবের পর যদি ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের বোর্ড অপসারণ চায় তাহলে ভেবে দেখতে হবে।" (জনকণ্ঠ, ২৮-৭)। অর্থাৎ সরকার কোন পদক্ষেপ নিলে 'খতিব সরকার' ব্যবস্থা নেবে। নিজেকে কতটা শক্তিশালী মনে করলে এ ধরনের জবাব দেয়া যায়।

আমরা আগেও বলেছি, এখনও বলছি, বাংলাদেশে খতিব সরকার চাই না। খতিব সরকারকে আরও প্রশ্রয় দিলে সরকার নিজের বিপদ ডেকে আনবে। সরকার এ বিষয়ে কি পদক্ষেপ নিবে তা স্পষ্টভাবে আমাদের বলে দেয়া উচিত। ধর্ম শুনলেই যদি সরকারের নীতিনির্ধারকরা মনে করেন, এদের প্রশ্রয় না দিলে রাজনৈতিক ক্ষতি হবে তাহলে বলব তাঁরা ভুল করবেন। বাংলাদেশে ফিৎনা সৃষ্টিকারীরা কখনও কব্জে পায় নি। সরকার কঠোর হলে তারা নিশ্চুপ থাকে। কারণ, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া তারা চলতে পারে না। ধর্ম ব্যবসায়ীদের কনসেশন দিয়ে কি ক্ষমতায় থাকা যাবে যদি আমরা আমজনতা সঙ্গে না থাকি? সম্প্রতি ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির এক সভায় অধ্যাপক কবীর চৌধুরী এ পরিপ্রেক্ষিতেই বলেছেন, "বর্তমান সরকার যদি রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারকারীদের সমর্থনে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায় তাহলে তাদের সে কৌশল আমরা সমর্থন করব না।" আঃ লীগ নেতা আব্দুল মান্নান বলেছেন, সরকার যদি তার (খতিব) বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করে তবে আওয়ামী লীগ কর্মসূচী গ্রহণ করবে।" (জনকণ্ঠ, ২৩-৭)। যদিও উক্তিটি কতটা বিশ্বাসযোগ্য জানি না, তবুও এ পরিপ্রেক্ষিতে বলব, আপনারা নামুন, আমরা আছি। যেখানে ছিলাম সেখান থেকে নড়িনি, নড়বও না। কিন্তু আপনারাই শুধু আসা-যাওয়ার মধ্যে আছেন।

(৩০/৭/৯৭ ইং তারিখের দৈনিক জনকণ্ঠের সৌজন্যে)

জবাই করো জবাই করো

মুনতাসীর মামুন

ছবিটি ছাপা হয়েছে দৈনিক আজকের কাগজে ২৬শে জুলাই। আওয়ামী লীগ কর্মি নুরু মিয়ার ছবি। ক্যাপশনে লেখা—'ছড়িয়ে আছে চাপ চাপ রক্ত। রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছেন তিনি পাশে জায়নামাজ। গতকাল জাতীয় মসজিদ বায়তুল মোকাররমে জুম্মার নামাজ পড়তে এসে এভাবেই মৌলবাদিদের হাতে নির্মমভাবে রক্তাক্ত হন রিকশা শ্রমিক লীগ নেতা নুরু মিয়া।' ছবিটি আমাকে সপ্তাহ দু'তিনেক আগের একটি ঘটনা মনে করিয়ে দিলো এবং কেনো যেনো মনে হলো, ঘটনা দু'টির মধ্যে একটি সম্পর্ক আছে।

তাহলে ফিরে যাই ১০ জুলাই'র ঘটনায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র সংগঠন-গুলোর মারামারি, কাটাকাটি, মিছিল নতুন কিছু না এবং পরিস্থিতি এমন যে, এগুলো না থাকলেই মনে হবে ক্যাম্পাস এতো অস্বাভাবিক রকম শান্ত কেনো? কিন্তু ১০ জুলাই ক্যাম্পাসে যে মিছিলটি হয়েছিলো তা ছিল অভিনব। কারণ, এ আগে কোনো একটি পত্রিকার পক্ষে মিছিল এবং এতোবড়ো সংঘর্ষ হয়নি। অনেকদিন পর বিদেশ থেকে ফেরা আমার এক সহকর্মি পরদিন উত্তেজিত স্বরে আমাকে জানালেন, 'তারা শ্লোগান দিচ্ছিলো জবাই করো জবাই করো। এটি কি ধরনের শ্লোগান!' রীতিমতো ভয়ার্ত তাঁর স্বর। কারণ, ক্যাম্পাসে 'তুলে নেব চামড়া' পর্যন্ত সহনীয় ছিলো। কিন্তু জবাই করো!

মিছিলটি ছিলো বাংলাদেশে ফিৎনা সৃষ্টিকারিদের মুখপত্র 'ইনকিলাব'-এর পক্ষে। এ মিছিলে যোগ দিয়েছিলো ছাত্রদলের কর্মিরাও। তারা শ্লোগান দিচ্ছিলো ইনকিলাব যারা বর্জন করতে বলেছেন তাদের বিরুদ্ধে। পরে সাধারণ ছাত্রদের ধাওয়া খেয়ে তারা পালিয়ে যায়। কিন্তু মূল বিষয় হলো 'জবাই করো'। ১৯৭১ সালে এই পত্রিকার একজন কর্ণধার ও তার সহযোগিরা বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের ঘর থেকে তুলে এনে জবেহ করেছিলো। সেই জবেহ'র আনন্দ এখনো তাদের রক্তে খেলা করে। ড্রাকুলার মতো রক্তই তাদের শরীরে শিহরণ জায়গায়। কিন্তু অবাক হয়েছি ছাত্রদলের সমর্থন দেখে! বিএনপি'র তো একাত্তরে রক্তপাতের কোন ঐতিহ্য নেই। ছাত্রদলের একসময়ের উপদেষ্টা ডঃ মোশাররফ হোসেন তো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রবাসে জোরেশোরে কাজ করেছিলেন। জবেহ তারাই করতে চায় যারা আধুনিক বিশ্বে স্থান করতে পারছে না যেমন, আফগানিস্তানের তালেবান বা আল-জেরিয়ার ধর্মপন্থিরা। আধুনিক যুবকরা বাংলাদেশে তাহলে কিভাবে সমর্থন করে ফিৎনা সৃষ্টিকারিদের!

যা হোক, এই জবাই কারো শ্লোগান শুনে হঠাৎ মনে হয়েছিলো, কোনো কিছুর কি প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে? নুরু মিয়ার রক্তাক্ত ছবি দেখে মনে হলো হ্যাঁ, কিছু একটার প্রস্তুতি নেয়া হচ্ছে।

ওই ঘটনার পর দেখা গেলো ধর্ম ব্যবসায়িরা মাঠে নামছে ও তাদের কাজের পরিধি বিস্তৃত করছে। বিএনপি প্রকাশ্যে তাদের সমর্থন যোগাচ্ছে। যে কারণে অনেকে মনে করেন বিএনপি এখন ধর্ম বাবসায়িদের বি-টিমে পরিণত হয়েছে। এদের বর্তমান ষ্ট্র্যাটেজি যে কোনোভাবে হোক ইস্যু সৃষ্টি করা, বিশৃঙ্খলা বাঁধানো যাতে অন্তিমে ইসলামি ঐক্য-জোটের ভাষায়, আওয়ামী লীগের তখত তাউস গুড়িয়ে দেয়া যায়।

এরপর তারা অধ্যাপক কবীর চৌধুরী, কবি শামসুর রাহমানের মতো বরেণ্য ব্যক্তিত্ব এবং সাংবাদিক কাজী শাহেদ আহমদ ও আলী আসগর প্রমুখকে মুরতাদ ঘোষণা করে রাস্তা দাপিয়ে বেড়িয়েছে। অধ্যাপক আসগরের মাথার দাম এক লাখ টাকা ঘোষণা করেছে। যে বাক্তিটি এ ঘোষণা দিয়েছে পাকি বা সৌদি টাকা না পেলে তাকে বিক্রি করলেও এক লাখ টাকা পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ।

আমরা এদের দাপাদাপি দেখে আশ্চর্য হইনি। গত একযুগ ধরেই তারা দাপাচ্ছে। এ দাপানির শুরু জেনারেল জিয়ার আমল থেকে, বিকাশ লাভ করে শিল্পী কামরুল হাসান কথিত 'বিশ্ব বেহায়া' জেঃ এরশাদের আমলে। বেগম জিয়া সস্নেহে শুধু প্রতিপালন নয় এদের নিয়ে সরকারও গঠন করেন। আমরা আশ্চর্য হয়েছি, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের বলে পরিচিত আওয়ামী লীগের নীরবতা দেখে। দেশে সরকার থাকলে কি যে কেউ যে কারো মাথার দাম ঘোষণা করতে পারে? দেশে একটি ধর্ম মন্ত্রণালয় আছে যার কর্ণধার একজন প্রতিমন্ত্রী। ধর্ম মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন ছাড়া কি কাউকে মুরতাদ ঘোষণা করা যায়? এসব প্রশ্ন কেউ করে নি সবাই ছিলো নিশ্চুপ। এ প্রশ্রয় পেয়ে ধর্ম ব্যবসায়িরা হরতাল আহ্বান করে ১৫ জুলাই।

ঈদে মিলাদুন্নবীর প্রক্কালে এ হরতাল আহ্বান ধর্মপ্রাণদের বিস্মিত করেছে। কায়রোয় ইসলামী সম্মেলন উপলক্ষে আগত বিশ্ব ইসলামী নেতারা এতে বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। তারা যেটি অনুধাবন করেননি সেটি হচ্ছে এরা ধর্ম ব্যবসায়ী, ধর্মপ্রাণ নয়। ধর্মকে ঢাল হিসেবে রেখে, এক ধরনের উদ্ভট ধর্মীয় পোশাক সৃষ্টি করে এরা নিরক্ষর অজ্ঞ মানুষের ওপর কর্তৃত্ব বিস্তার করতে চায়। আসল লক্ষ্য রাষ্ট্রক্ষমতা। এ হরতালও সরকার বা সরকারি দল প্রতিরোধ করতে পারেনি। নির্বাচনের পুর্ব থেকে আমরা লক্ষ্য করছি, ধর্ম ব্যবসায়ীদের প্রশ্নে আওয়ামী লীগে এক ধরনের দোদুল্যমানতা বিদ্যমান। একদিকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের হিসেবে নিজেদের তুলে ধরা অন্যদিকে এ প্রশ্রয় কোনভাবেই কাম্য নয়। কারণ তা শুধু আওয়ামী কর্মি নয়। সাধারণ সমর্থকদের বিভ্রান্ত করে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশে দেখা গেছে, যারাই ধর্ম ব্যবসায়িদের প্রশ্রয় দিয়েছে তাদেরই পতন ঘটেছে।

হরতালের পর ঈদে মিলাদুন্নবী। সেখানে রাষ্ট্রপতি ও ধর্মপ্রতিমন্ত্রী অন্য কথায় সরকারকে পাদুকা প্রদর্শন করে ইসলাম ধর্ম ব্যবসায়িরা। পত্র-পত্রিকায় অভিযোগ করা হয় যে এর জন্যে বায়তুল মোকাররমের খতিব দায়ী। ধর্ম প্রতিমন্ত্রী স্বয়ং তাঁকে অভিযুক্ত করেন। খতিব বলেছেন, তিনি এর জন্যে দায়ী নন। কিন্তু এরশাদ কর্তৃক নিযুক্ত এই খতিবের পুর্ব ইতি-

হাস দেখুন। ধর্ম প্রতিমন্ত্রী বলছেন, খতিব ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিলেন। হতে পারে, না হলে তিনি মানিক মিয়া এভেনিউতে কেনো মুক্তিযোদ্ধাদের গাদ্দার বলবেন? শুধু তাই নয়, কারণে অকারণে কাদিয়ানীদের নিয়েও বিভিন্ন অইস্যু তুলে তিনি রাজনৈতিক সভায় বক্তব্য রেখেছেন। বর্তমান সরকার কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে যা হবার তাই হয়েছে। সরকারকে তারা চড় মেরেছে।

এ ঘটনার পর আওয়ামী লীগের ইজ্জতে খানিকটা লেগেছে। জনসভা করে আওয়ামী লীগ নেতারা ঘোষণা করেন শুক্রবার জুম্মার নামাজ বায়তুল মোকররম মসজিদে পড়ে, মসজিদকে রাজাকার মুক্ত করা হবে। নামাজ পড়ে মসজিদ রাজাকার মুক্ত করা যায়? রাজাকার মুক্ত করতে হলে আগে ইসলামি ফাউণ্ডেশনের কর্তৃত্ব বদল করতে হবে। আজকের কাগজ পড়েই জানা গেলো, আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব জুম্মার দিন নিষ্ক্রিয় থাকে। এ নিষ্ক্রিয় থাকার কথা যারা জানতেন না তারাই মসজিদে গিয়ে খতিবপন্থী দলের হাতে মার খায়। নুরু মিয়া আওয়ামী লীগ কর্মি কি না তা কারো জানার কথা নয়। কিন্তু পরনে ছিলো তার মুজিব কোর্ট। সুতরাং মসজিদেই তাকে রক্ত দিতে হয়। এ বিষয়ে আওয়ামী লীগ নেতারা কোন মন্তব্য করেন নি।

এটি স্পষ্ট হয়ে উঠছে যে, '৭১ সালের যুদ্ধাপরাধী জামাত, স্বাধীনতা পরবর্তী পাকি মনোভাবের দলসমূহ যেমন-ইসলামি ঐক্যজোট, জাগপা প্রভৃতি এক হয়েছে এবং একেকটি ঘটনা সৃষ্টি করে নিজেদের শক্তি পরীক্ষা করছে। গুটিকয় বুদ্ধিজীবী, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ, সমন্বয় কমিটি ও ছোট ছোট কিছু দল ছাড়া কেউ তাদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেনি। তাদের এই জোটে এখন বিএনপি যোগ দিয়েছে। মসজিদে নুরু মিয়ার রক্তাক্ত ছবি দেখে মনে হলো, তারা জবেহ করার একটি পরিকল্পনা নিয়ে এগুচ্ছে। এ কথা মনে করার কারণ, ওই দিন শুক্রবার জুম্মার নামাজে মুসল্লিদের নাজেহাল করার পর ইসলামী ঐক্যজোট ঘোষনা করেছে বায়তুল মোকাররম মসজিদের মিম্বরে 'মওলানা উবায়দুল হকই বসবেন।' খতিব এখন একটি প্রতীক ধর্ম ব্যবসায়িদের। এতো কিছু করার পর তিনি থাকলে আমাদের মেনে নিতে হবে সরকার এদের মেনে নিয়েছে। এরপর তারা তাদের জবাই করো জবাই করো পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হবে। সরকার হয়তো তাও মেনে নেবে, হয়তো এ কথা মনে রেখে যে আপস করলে হয়তো ক্ষমতায় থাকা যাবে। তবে এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা ভালো। পাকিস্তান সরকার সম্প্রতি মসজিদ থেকেও ধর্ম ব্যবসায়িদের গ্রেফতার করতে দ্বিধা করছে না। কারণ, নেওয়াজ শরীফ বুঝতে পেরেছেন বিষধরদের প্রশ্রয় দিতে নেই।

আমরা আগেও বলেছি, এখনো বলছি, ধর্ম ব্যবসায়িদের জন্যে বাংলাদেশ হয়নি।

ধর্ম ব্যবসায়িদের প্রশ্রয় দিয়ে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়ন করা যায় না। যদি কেউ তা বলে, তা হবে ভণ্ডামি। ধর্ম শুনলেই যদি সরকারের নীতি নির্ধারকরা মনে করেন, তাদের প্রশ্রয় না দিলে রাজনৈতিক ক্ষতি হবে তাহলে তারা ভুল করবেন। বাংলাদেশে ফিৎনা সৃষ্টিকারীরা কখনো কব্জে পায়নি। সরকার কঠোর হলে তারা নিশ্চুপ থাকে। এর উদাহরণ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ধর্মব্যবসায়িদের কনসেশন দিয়ে কি ক্ষমতায় থাকা যাবে যদি আমরা আমজনতা সঙ্গে না থাকি?

সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, খতিব বলেছেন, আমি জোর করে থাকতে চাই না। মসজিদের মুসল্লিরা চাইলে আমি অপসারণ মেনে নেবো। কিন্তু আমার জবাবের পর যদি ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের বোর্ড অপসারণ চায় বা অপসারণ করে তা হলে ভেবে দেখতে কবে।' (জনকণ্ঠ ২৮-৭-৯৭)। শুধু তাই নয়, কাদিয়ানিদের অমুসলিম ঘোষণার দাবিতে খতিব এক মহাসমাবেশ আহ্বান করেছেন। ইসলামি জোট শিখা চিরন্তনের বিরুদ্ধেও সমাবেশ আহ্বান করেছে। সরাসরি তারা সবাই সরকারের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। এ চ্যালেঞ্জে জিতলে শুরু হবে 'জবাই করো জবাই করো।'

কাদের জবাই করো-এ কথা নিশ্চয় আপনারা বুঝতে পারছেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা অবশ্যই চাইবো সরকার ধর্ম ব্যবসায়িদের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করবে। এক্ষেত্রে অপারগতা দেখালে আমাদের সামনে দু'টি বিকল্প থাকবে। তার একটি উল্লেখ করেছেন অধ্যাপক কবীর চৌধুরী এক বক্তৃতায়—'বর্তমান সরকার যদি রাজনীতিতে ধর্মের ব্যবহারকারিদের সমর্থনে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায় তাহলে তাদের সে কৌশল আমরা সমর্থন করবো না।' অর্থাৎ হয় আমরা নিষ্ক্রিয় থাকবো, নয় যে যার নিজস্ব উপায়ে 'জবাই করো' থেকে বাঁচার চেষ্টা করবো। আরেকটি উপায় আছে যা কোরআনে সূরা নিসায় উল্লেখ করা হয়েছে—'অবশ্য তোমরা কিছু লোক পাবে যারা তোমাদের কাছেও তাদের সম্প্রদায়ের কাছে বিশ্বাস অর্জন করতে চায়। যখনই তাদের ফিৎনায় ফিরান হয় তখনই তারা উল্টিয়ে যায়। যদি তারা তোমাদের কাছ থেকে চলে না যায়, তোমাদের কাছে শান্তি প্রস্তাব না করেও তাদের হাত না সামলায় তবে তাদের যেখানেই পাবে পাকড়াও করবে··· আর আমি তোমাদের এইসব প্রতিরোধের সুষ্ঠু অনুমতি দিয়েছি।'

(৩/৮/৯৭ তারিখের দৈনিক আজকের কাগজের সৌজন্যে)

খতিব উবায়েদুল হক সাহেবকে ক'টি প্রশ্ন

১। আপনি বলেছেন আপনি রাজনীতি করেন না বা কোন বিশেষ দলের হয়ে কাজ করেন না—

প্রশ্ন: তাই যদি সত্য হয় তাহলে ১৯৯৩ সালে পাকিস্তান সফরে গিয়ে জামাতে

ইসলামী পাকিস্তানের নেতাদের সঙ্গে দেখা করেছিলেন কেন? (দৈনিক পাকিস্তান লাহোর এবং দৈনিক জং ৫-১২-৯৩ দ্রষ্টব্য)।

২। ১৯৯৩ সালে ২৪শে ডিসেম্বর ঢাকার মানিক মিয়া এভিন্যুতে আপনি যে সমাবেশ করেছিলেন তাতে পাকিস্তানে-ধোঁকাবাজ/দাঙ্গাবাজ মৌলানা বলে পরিচিত কুখ্যাত মঞ্জুর চিনিউটি (দৈনিক আফাক দ্রষ্টব্য) এবং কোর্ট কর্তৃক 'টাউট' ঘোষিত আল্লাহ ওয়াসায়াকে (ডন ১৪-২-১৯৮৫) এনেছিলেন।

প্রশ্ন: নিজ দেশে যারা 'ধোঁকাবাজ' ও 'টাউট' বলে পরিচিত তাদেরকে এনেছিলেন কোন উদ্দেশ্যে?

৩। পাকিস্তানের মূলতান শহরের তাহফুজে খতমে নবুওত সংগঠনের বাংলাদেশের প্রধান আপনি। আপনার দাবি এটি একটি অরাজনৈতিক ধর্মীয় সংগঠন।

প্রশ্ন: তাই যদি হয় তাহলে উক্ত 'ধর্মীয়' (?) সংগঠনটি ১৬ই ডিসেম্বরকে (যে দিনকে আমরা বিজয় দিবস হিসেবে পালন করে থাকি) 'ঢাকা পরাজয়' দিবস হিসেবে পালন করে থাকে কেন? (পাকিস্তানের দৈনিক জং ১৫-১২-৯৪ এবং বাংলাদেশের জনকণ্ঠ ভোরের কাগজ ১৯-১২-৯৪ দ্রষ্টব্য)।

৪। আপনারা তাহফুজে খতমে নবুওতকে 'আন্তর্জাতিক' সংগঠন হিসেবে দাবি করে থাকেন।

প্রশ্ন: ক) পাকিস্তান ও বাংলাদেশ (এদেশে আপনি যার প্রধান) ছাড়া বিশ্বের আর কোন দেশে কি এর শাখা রয়েছে? থাকলে দয়া করে ঠিকানা বলবেন কি?

খ) ওরা পাকিস্তানি হিসেবে ১৬ই ডিসেম্বরকে 'ঢাকা পরাজয় দিবস' হিসেবে পালন করে থাকলে বাংলাদেশী (বাঙালি বললাম না) হিসেবে আপনারা কি কখনো ঐ দিনটিকে বিজয় দিবস হিসেবে পালন করেছেন?

৫। পাকিস্তান থেকে যে ধোঁকাবাজ/দাঙ্গাবাজ মৌলভীকে আপনি সাদর অমন্ত্রণ জানিয়ে আনলেন সেই মঞ্জুর চিনিউটি ত্রিশ লাখ শহীদের ('৭১-এ আপনারা যাদের দুষ্কৃতকারী ও ভারতীয় চর বলতেন) রক্তে স্নাত বাংলার মাটিতে দাঁড়িয়ে সদম্ভ উক্তি করল-'৭১ সালে পাকিস্তানি সৈন্যরা ইসলামের স্বার্থেই বাংলাদেশে লড়াই করেছে (৭ মাঘ, ১৪০০ বাংলা দৈঃ জনকণ্ঠ দ্রঃ)—কত বড় স্পর্ধা। এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কি?

৬। পাকিস্তান থেকে ধোঁকাবাজ/দাঙ্গাবাজ-টাউট মৌলভীদের আমদানি করলেন বাংলাদেশে 'কাদিয়ানীদের' অমুসলিম ঘোষণার জন্য বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে।

প্রশ্ন: ভিন দেশের নাগরিকদের এনে এহেন কর্মকাণ্ড কি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে বিদেশী হস্তক্ষেপের সামিল নয়? (অবশিষ্টাংশ ৩৯ পৃষ্ঠায় দেখুন)

গোলাপ গাছের কাঁটা

—আহমদ সেলবর্সী

বাগানে গিয়ে দেখি নানা ফুলের মেলা,
মৌলোভীরা উড়ে বেড়ায় সকাল সন্ধ্যা বেলা।
হলুদ, সাদা, বেগুনী রং আরো আছে কাল,
আমি একটি গোলাপ চাই যার রং ভাল।
কোনটিকে নেব আমি কোনটিকে রেখে—
গোলাপ নিলে গোলাপীই নেব আমি দেখে।
সুন্দর একটি ফুল বেছে নিলাম হাতে,
মসৃণ, সুন্দর, তাজা, সুগন্ধও যাতে।
মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম তার রূপ গুণ যত,
হঠাৎ দেখি আমার দেহ ক্ষত বিক্ষত।
বসন আমার ছিন্ন ভিন্ন নাই কিছু অক্ষত,
ঝরছে রক্ত দেহ থেকে বেদনা অবিরত।
বৃক্ষটি তার কাঁটা দিয়ে করেছে এই 'পাপ',
সর্বাঙ্গে ব্যথা তবু হাতে সেই গোলাপ।

(৩৮ পৃষ্ঠার অবশিষ্টাংশ)

৭। মানিক মিয়া এভিন্যুর উক্ত সমাবেশে আপনি বললেন, "'৭১ সালে একদল ইংরেজি শিক্ষিত গাদ্দার পাকিস্তান ভেঙ্গে ছিল" (দৈনিক আজকের কাগজ, জনকণ্ঠ, ভোরের কাগজ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য, তাছাড়া এর ভিডিও-ও রয়েছে)।

প্রশ্ন: কত বড় দুঃসাহস। এজন্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে আপনার বিচার হওয়া উচিত নয় কি?

৮। আপনি 'জাতীয় মসজিদ' বায়তুল মোকাররমের খতিব। খতিব অর্থ যিনি খুতবা দেন।

প্রশ্ন: ক) 'জাতীয় মসজিদ' বলতে কি বুঝায়?

খ) এটি কোন্ জাতির জাতীয় মসজিদ?

গ) যদি বল হয় বাঙালি বা বাংলাদেশী জাতির জাতীয় মসজিদ তাহলে তো সকল বাঙালি বা বাংলাদেশীর মসজিদ এটি।

ঘ) আর যদি বলেন যে, এটি মুসলমান জাতির তাহলে তা কেবল বাংলাদেশের জাতীয় হয় কিভাবে? মুসলিম তো সমগ্র বিশ্বের। তাছাড়া বায়তুল মোকাররম মসজিদ তো প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল অবাঙালি ব্যবসায়ীদের অর্থ দ্বারা এবং এর উদ্বোধন করেছিল প্রেসিডেন্ট (তৎকালীন) আয়ুব খান।

খত্তিব সাহেব দয়া করে, পত্রিকার মাধ্যমে জবাব দেবেন। তাহলে আমি ছাড়াও অগণিত দেশবাসী এ থেকে উপকৃত হবে?

আবু তৌসিফ আবদুল্লাহ
৫০/২, তাজমহল রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা

(৭/৭/৯৭ তারিখের দৈনিক সংবাদের সৌজন্যে)

কার না কার

(করো, কোর না)

(একটি ওয়াকফে নও পাঠ্য-সূচী)

মূল সংকলক : হযরত ডাঃ মীর মুহাম্মদ ইসমাঈল (রাঃ), সিভিল সার্জন

অনুবাদ—মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

(ষষ্ঠ কিস্তি)

- তুমি রাত্রে ঢাকনা বিহীন আলো সম্বলিত বাতি ও ঢাকনা বিহীন আগুন নিভিয়ে ঘুমাও।
- তুমি অন্যের পুস্তকে তার অনুমতি ব্যতিরেকে চিহ্ন লাগিও না, এর ওপরে নোটও লিখবে না।
- তুমি পানির পেয়ালা ঢেকে রাখো।
- তুমি অন্যের সামনে নাকে আঙ্গুল প্রবেশ করাবে না।
- তুমি যখন সভাতে বসবে তখন (দাঁত) খেলাল করবে না।
- তোমার হাই তুলতে হলে মুখে হাত রেখে নাও।
- তুমি পানীয় জলে নিজের আঙ্গুল বা হাত ডুবিও না।
- তুমি তরকারী মাখা হাত দাড়ীতে মুছবে না
- তুমি লেখার সময়ে কলম ঝেড়ে আশে পাশের জিনিষ কালি দ্বারা নষ্ট করবে না।
- তুমি খাবার খেয়ে এমনভাবে হাত ধৌত করো যে, আঙ্গুলে তেলের ও হলুদের দাগ অবশিষ্ট না থাকে।
- তুমি কালি দ্বারা তোমার হাত ও কাপড় নষ্ট কোর না।
- হে যুবক! তুমি মেয়েদের মত সাজ-সজ্জা ও প্রশাধনী নিয়ে লেগে থাকবে না।
- তুমি ঘরের দরজা ও উঠানে থুথু বা পানের পিক ছিটিয়ে নোংরা করবে না।
- তুমি মুখে তোমার নখ পুরবে না।
- তুমি যতদূর সম্ভব থুথু লাগিয়ে কাগজ উল্টাবে না বরং পানি ব্যবহার করো।
- তুমি সভায় বসে তোমার আঙ্গুল ফুটিও না।

- তুমি চোখ বন্ধ করে বা অতিরিক্ত অঙ্গভঙ্গি করে কথা বলার অভ্যেস করবে না।
- তুমি তোমার কাপড় বা পুস্তক মুখে পুরে চুষবে না এবং দাঁত দিয়ে কাটবে না।
- তুমি যতদূর সম্ভব তোমার মেয়েকে পনর বা ষোল বছর বয়সে বিয়ে দিবে।
- তুমি যুবতী বিধবা নারীর পুনঃ বিয়ে শাদীর চেষ্টা করবে।
- হে মহিলা! তুমি না-মোহরাম পুরুষের সম্মুখে তোমার সৌন্দর্য প্রকাশ করবে না।
- তুমি তোমার জামার আস্তিন দ্বারা নিজের নাক মুছবে না।
- যখন তুমি বাজারের মধ্য দিয়ে পথ চলো তখন পথিকদের সালাম করো। কারও রাস্তায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি কোর না, রাস্তার এক পাশ দিয়ে চলো।
- এমনসব সংগঠন, সোসাইটি বা কমিটির সদস্য হও যেগুলোর কাজ হলো গরীবদের সাহায্য ও পুণ্য কর্মের প্রচার এবং জনগণের কল্যাণ করা।
- তুমি এমন সংগঠনের সদস্য হও যার কাজ হলো ফিৎনা ফাসাদ প্রতিহত করা। নিরাপত্তা ও স্বস্তির অবস্থা সৃষ্টি করা এবং লোকদের সংশোধন করা।
- তুমি কোন মারাত্মক অস্ত্র কোন মানুষের প্রতি তাক কোর না।
- তুমি মসজিদে এবং জনসভায় নিজের ভাল কাপড়-চোপড়-পরিধান করে উপস্থিত হও।
- তুমি তোমার সন্তানদেরকে খারাপ কথা-বার্তা থেকে বিরত রাখো।
- উত্তম কথায় উৎসাহ প্রদান করো আর তাদেরকে কষ্ট সহ্য করতে শিখাও।
- তুমি যতদূর সম্ভব সর্বদা সত্য ও মার্জিত পদ্ধতিতে বিতর্ক করো এবং সাধারণতঃ ব্যক্তিগত ব্যাপারে আক্রমণ করবে না।
- তুমি নিজে কথা বলে নিজে হেসো না।
- তুমি কোন সম্মেলনে লোকদের ওপর দিয়ে লাফ মেরে প্রবেশ কোর না।
- যে ব্যক্তির সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বিয়ে করে না সে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।
- যে ব্যক্তি পরিবার পরিজনের বোঝা বহনের প্রতি দৃষ্টি রেখে বিয়ে না করে সে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।
- যদি তোমার সামর্থ্য থাকে তাহলে নিজের নিকট অবশ্যই ঘড়ি রাখো।
- তুমি বাজারে খালি পায়ে ও নগ্ন শিরে হাঁটাহাঁটি করবে না।
- যখন দুই ব্যক্তি কথা বলতে থাকে তখন তুমি অনর্থক তার মধ্যে নাক গলিও না।
- তুমি তোমার খাবার-দাবারকে ধুলি-ময়লা থেকে রক্ষা করো। (চলবে)

সংবাদ

সীরাতুন্নবী (সাঃ) জলসা অনুষ্ঠিত

পরবর্তীতে জানা গেছে যে, এসব জামাত ও সংগঠনও সীরাতুন্নাবী (সাঃ)-এর জলসার আয়োজন করেছে : আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তেরগাতি, খাগদান, ক্রোড়া, বগুড়া, রঘুনাথ পুর বাগ, ঢাকা (মীরপুর) ও সুলতানপুর এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্, ঢাকা। আহমদী বার্তা

স্থানীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত

গত ৮ই আগষ্ট '৯৭ জুমুআর নামাযের পরে মজলিসে আনসারুল্লাহ্ ঢাকার ১১তম স্থানীয় ইজতেমার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই ইজতেমা শনিবার দিন পর্যন্ত চালু ছিল। শনি বার বাদ আসর সমাপ্তি অধিবেশনের মধ্য দিয়ে এ ইজতেমার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। নানা প্রকার ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও খেসাধূলা এর কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিলো। আহমদী বার্তা

শুভ বিবাহ

অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, গত ১৪/১২/৯৬ ইং তারিখে শাহবাজপুর জামাতের জনাব আলী আজগর সাহেবের কনিষ্ঠ পুত্র মোহাম্মদ গোলাম মোস্তফার সহিত দুর্গারামপুর নিবাসী জনাব আঃ মান্নান চৌধুরীর ৩য়া কন্যা শারমিন আক্তার তামান্নার শুভ বিবাহ ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা দেন মোহর ধার্যে কন্যার পিত্রালয়ে সুসম্পন্ন হয়। বিবাহের এলান করেন স্থানীয় মোয়াল্লেম।

নব দম্পতির সার্বিক সুখ শান্তির জন্য জামাতের সকলের নিকট দোয়ার আবেদন রইল।

মোহাম্মদ শাহ আলম খান
মোয়াল্লেম, দুর্গারামপুর

শোক সংবাদ

০ আমার শ্বাশুড়ী চরদুখিয়া নুসরতাবাদ জামাতের সাবেক প্রেসিডেন্ট মরহুম আবুল বাশার পাটোয়ারী সাহেবের স্ত্রী মোসাম্মৎ ফাতেমা খাতুন বিগত ২৯শে জুলাই '৯৭ রোজ মঙ্গলবার দিবাগত রাত ১১টা ৫৫ মিঃ ইন্তেকাল করেন। (ইন্নালিল্লাহে .....রাজেউন)। তাঁর রূহের মাগফেরাতের জন্যে সকলের নিকট দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি। হাবিবুর রহমান
বনানী, ঢাকা

০ আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আহমদী পাড়া নিবাসী মরহুম আব্দুল হেকিম এর স্ত্রী মোসাম্মৎ মোমেনা খাতুন প্যারালাইসিস ও বার্ধক্যজনিত কারণে গত ২১শে জুলাই '৯৭ রোজ সোমবার বেলা ২-৫৫ মিঃ ইন্তেকাল করেছেন, (ইন্নালিল্লাহে .....রাজেউন)। মৃত্যুকালে মরহুমার বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর। তিনি ৪ ছেলে ও ২ মেয়েসহ নাতি-নাতনী ও অসংখ্য আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনার জন্য সকল আহমদী ভাই ও বোনের নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন জানাচ্ছি। মোস্তফা জামান

আসহাবে কাহাফের পাতা

আবু রকীম

প্রশ্ন : ১৯৬৩ সালের ৩রা নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় কি ঘটেছিল ?

উত্তর : আমি ১৯৬১ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের খোদ্দামুল আহমদীয়ার আঞ্চলিক প্রধান ছিলাম। আমার মেয়াদকালের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয় ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় ১৯৬২ সালের চার ও পাঁচ নভেম্বর তারিখে। অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এই ইজতেমা সমাপ্ত হয়। সদর মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া মির্যা রফি আহমদ সাহেব এই ইজতেমায় যোগদান করেন। পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ ১৯৬৩ সালে ২রা ও ৩রা নভেম্বর ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় লোকনাথ ট্যাঙ্কের পাড়ে দ্বিতীয় বাৎসরিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে খোদ্দামরা এতে যোগদান করেন।

প্রোগ্রাম ছিল ৪ঠা নভেম্বর সকালে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার ৪৭তম সালানা জলসা অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু ওখানকার কর্মকর্তারা হঠাৎ করে জলসার প্রোগ্রাম পরিবর্তন করে পরদিন সকালের পরিবর্তে ৩রা নভেম্বর রাতেই মুক্ত ময়দানে জলসা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। আমি এতে আপত্তি জানাই। কিন্তু জামাতের কর্মকর্তারা তাতে কর্ণপাত না করে মাগরিবের পর জলসার কাজ শুরু করেন। সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ সোহেল আহমদ সি, এস, পি। বক্তা ছিলাম আমি। আমার বক্তব্য বিষয় 'ইমাম মাহদীর সত্যতা'। আমি সূরা তাকভীর পাঠ করে বক্তৃতা শুরু করি।

আমাদের জলসার নূতন প্রোগ্রাম এর সংবাদ পেয়ে মৌঃ তাজুল ইসলাম বিকাল বেলা সড়ক বাজারে এক সভার আয়োজন করে লোকদেরকে উত্তেজিত করে তোলে। বিকাল থেকেই মাইকে এই সভার উত্তেজনাকর প্রচারণা চলছিল। তা সত্ত্বেও জলসার কর্মকর্তারা সে বিষয় কোন গুরুত্বই দিলেন না। কেউ কেউ বললেন, ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় জলসা আক্রমণ করার সাহস গয়ের আহমদীদের হবে না। আগের দিন রাতে এক ব্যক্তিকে ধারাল দা সহ ধরে থানায় সোপর্দ করা হয়েছিল। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার ইদ্রিস সাহেব আগের দিন স্বপ্নে দেখেছিলেন যে, আমাদের উপর আক্রমণ হয়েছে। তিনি চীৎকার দিয়ে ঘুম থেকে উঠেন। কয়েকদিন আগে আমিও স্বপ্নে দেখেছিলাম যে, আমি পুকুরের পাড়ে গিয়েছি এবং বিরুদ্ধবাদীরা আমাদের

উপর ঢিল মারছে। এতসব সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ রাতের বেলায়ই মুক্ত ময়দানে জলসা করার ব্যাপারে অটল থাকলেন।

কুরআন, হাদীস, বাইবেল ইত্যাদি থেকে আমি উদ্ধৃতি পেশ করে মাত্র ১০-১৫মিনিট বক্তৃতা করার পর বিরুদ্ধবাদীরা ব্যাপক আক্রমণ চালায়। আমাকে লক্ষ্য করে পাথর মারতে থাকে। একটি পাথর আমার হাতের নোট বইটিতে আঘাত হানে। বাধ্য হয়ে মাথায় চেয়ার দিয়ে আক্রমণ প্রতিহত করতে থাকি। শেষ পর্যন্ত পশ্চিম দিকে একটি গর্তের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করি। বৃষ্টির মত ইট পাটকেল বর্ষিত হচ্ছে। অনেকেই আহত হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছেন। আহতদের মধ্যে ওসমান গনী এবং আব্দুর রহীম সাহেবের অবস্থা গুরুতর। সংবাদ দেয়া সত্ত্বেও পুলিশ আসতে দেরী করছে। হঠাৎ আল্লাহ্‌র রহমতস্বরূপ প্রচণ্ড ঝড় শুরু হয়ে গেল। পশ্চিম দিকের প্রকাণ্ড বট গাছটির ডাল কড়মড় করে ভেঙ্গে পড়তে লাগল। বিরুদ্ধবাদীরা ঝড়ের দাপটে ময়দান ছেড়ে চলে গেল। বৃষ্টি বর্ষিত হল অসহায় আহমদীদের উপর। ঝড়ের পরে পুলিশ এল দর্শকের মত। আহতদেরকে হাসপাতালে পাঠান হল। হাসপাতালে পরের দিন সকাল ৬-৩০ মিনিটে উসমান গনী এবং ১০-৩০ মিনিটে আব্দুর রহীম শাহাদাত বরণ করেন। ওসমান গনী মানিকগঞ্জের সাটুরীয়ার অধিবাসী এবং আব্দুর রহীম তারুয়ার অধিবাসী ছিলেন। প্রথম জন খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্য এবং দ্বিতীয় জন আনসারুল্লাহর সদস্য ছিলেন।

কেউ কেউ এই ঘটনাটি খোদ্দামদের ইজতেমায় হয়েছিল বলে প্রচার করেন। অথচ ঘটনাটি ঘটেছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ৪৭তম সালানা জলসায়।

কবি সলীমউল্লাহ গেয়েছেন,—

বিংশ শতের তেষট্টি আজি তেসরা নভেম্বর
সাত চল্লিশা সালানা জলসা ব্রাহ্মণবাড়ীয়া পর।
সন্ধ্যার পরে বক্তৃতা করে আহমদ তৌফিক
ইমাম মাহদী আসিয়াছে ভবে দলীল প্রমাণে ঠিক।

বিরুদ্ধবাদীরা আমাদের ২৩ জনকে আসামী করে এক মিথ্যা মামলা দায়ের করে। আমার নামে পি, এস, কেস নং ৫ (১১) ৬৩, জি, আর, কেস নং ৭৯১/৬৩ দায়ের করে এবং আমার নামে নন বেইলেবল ওয়ারেন্ট বের হয় ১৬/১২/৬৩ তারিখে। বি, বাড়ীয়া কোর্টে হাজির হয়ে জামিন প্রাপ্ত হই। ৩১/৭/৬৫ তারিখে মোকদ্দমা সেশনে সুপর্দ করা হল। বি, বাড়ীয়ায় হাকিম ছিলেন খাজা আব্দুল হালিম। আমাদের বিরুদ্ধে আইনজীবীর নাম ছিল রেহান উদ্দীন। আমাদের পক্ষে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় কোন উকিল পাওয়া গেল না। কুমিল্লা

থেকে সতীশ চন্দ্র দে নামে এক উকিলকে আনা হল। তৎসঙ্গে ছিলেন ব্যারিষ্টার শামসুর রহমান এবং সন্দ্বীপের জাহিদুর রহীম। এই জাহিদুর রহীম সাহেবকে পাক আর্মি ১৯৭১ সালে হত্যা করে। কুমিল্লায় এডিশনাল জজ চট্টগ্রাম নিবাসী মফিজুল হকের এজলাসে বিচার হয় এবং ১৩/৬/৬৬ তারিখে খালাস পাপ্ত হই। স্বপ্নে দেখেছিলাম আমার সাইজ মত কয়েদীর পোষাক পাওয়া যায় নি। কুমিল্লায় আমরা মির্যা আলী আকন্দ সাহেবের বাসায় থাকতাম। ব্রাহ্মণবাড়ীয়ায় থাকতাম প্রেসিডেন্ট কফিল উদ্দীন সাহেবের বাসায়। এই মোকদ্দমায় আসামী ছিলাম—

(১) ফারুক আহমদ (২) সৈয়দ এজাজ আহমদ (৩) গোলাম সামদানী খাদেম (৪) সলীম উল্লাহ (৫) আনোয়ার হোসেন (৬) সাহেব আলী (৭) মোবাশ্বের (৮) সালেহ আহমদ (৯) ফরিদ আহমদ (১০) জারু মিয়া (১১) বশির (১২) (১৩) সাদির খাঁ (১৪) মমিন খাঁ (১৫) আজিজ খাঁ (১৬) সামাদ মিয়া (১৭) আব্দুল আলীম (১৮) কমরুল (১৯) মীর আব্দুর রেজ্জাক (২০) সোনা মিয়া (২১) ইকবাল খাঁ (২২) আলী আহমদ লস্কর (২৩) আমি আহমদ তৌফিক। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, আমি নাকি মহানবীকে (সাঃ) আক্রমণ করে বক্তৃতা দিচ্ছিলাম (নাউযু-বিল্লাহ্) ফলে হাঙ্গামা সৃষ্টি হয়। এক মৌলবী সাক্ষ্য দিতে যেয়ে এই কথা বলে। তবে কাঠ গড়ায় সে আমাকে সনাক্ত করতে পারে নি। কারণ সে আমাকে কখনও বক্তৃতা করতে দেখেনি। বিরুদ্ধবাদী উকিল আমাকে জেরা করে বলে যে, আপনি কুরআন, হাদীস, বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে পনর মিনিট বক্তৃতা করার পর হাঙ্গামা শুরু হয়। পনর মিনিটে কি এই তিনটি গ্রন্থ থেকে হাওয়ালা দেয়া সম্ভব? আমি বললাম, পনর সেকেণ্ডেও সম্ভব। যেমন, চন্দ্র সূর্যের গ্রহণ হবে একথা কুরআন, হাদীস ও বাইবেলও বলে। এমনি আরো আকর্ষণীয় বহু প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে আমাকে। একটি প্রশ্ন ছিল, কুরআনকে কি আপনি পাইকারী জিনিস মনে করেন? উত্তরে বললাম, অবশ্যই কুরআন কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। কুরআন সবার। দুঃখ এবং কষ্টের মধ্যেও যে আনন্দ আছে তা আমি ঐ সময় উপলব্ধি করতে পেরেছি।

ভবিষ্যতে যারা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করবেন তারা এই সব খণ্ড খণ্ড ঘটনা থেকেও ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করবেন; এই সব ঘটনাকে অক্ষরে আবদ্ধ না করলে ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কল্পনার উপর নির্ভর করে কবিতা লিখা যায়, ইতিহাস লিখা যায় না। ইতিহাস রচনা করতে চাইলে প্রমাণ লাগে।

(সম্পাদকীয়-এর অবশিষ্টাংশ)

মির্যা নাসের আহমদ (রাহেঃ)। এতে খরচ হয় ৩০ লক্ষ পাকিস্তানী রূপী। তখন থেকে সেখানে মহান আযান ধ্বনিত হয়ে আসছে এবং কেয়ামত পর্যন্ত ধ্বনিত হতে থাকবে ইনশাআল্লাহ্। ঐ প্রসঙ্গে নমুনাস্বরূপ দু'একটি পত্রিকার রিপোর্টের বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো সকলকে পুনরায় স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে :

"আহমদীরা তাদের মসজিদ উদ্বোধন করলো গতকাল তাদের ইমাম মির্যা তাহের আহমদের হাত দিয়ে

গতকাল আন্তর্জাতিক জামা'তে আহমদীয়া তাদের ইমাম হযরত মির্যা তাহের আহমদের হাত দিয়ে পেড্রোয়াবাদে তাদের মসজিদ বাশারত উদ্বোধন করে দিলো। বাশারত-এর অর্থ বর্ণিত হয় এমন মসজিদ যা সুখবর দান করে। এ মসজিদটি কর্ডোভায় ৭০০ বৎসর পরে নির্মিত হলো। আর ইহা হলো জামা'তে আহমদীয়ার (স্পেনে) প্রথম মসজিদ।

এ অনুষ্ঠানে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত জামা'তে আহমদীদের সদস্যবৃন্দ এবং স্থানীয় জনপদ পেড্রোয়াবাদ ও আশে পাশের অধিবাসীরা যোগদান করেন। কর্ডোভার ইনচার্জ পাদ্রী বালেরিয়ান ওডিন, ফিজিক্সে নোবেল বিজয়ী ডঃ আব্দুস সালাম এবং ইউ, এন, এর জেনারেল এসেম্বলীর সাবেক প্রেসিডেন্ট জনাব মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খানও অংশগ্রহণ করেন" [LAVOZ DE CORDOBA (কর্ডোভার কণ্ঠ স্বর) পত্রিকার ১১-৯-৮২ তারিখের সংখ্যার শীর্ষ খবর]

"ইসলামের ঐতিহ্যমণ্ডিত স্পেনের কর্ডোভা নগরীর অনতিদূরে প্রেড্রোয়াবাদে 'মসজিদে বাশারত' নামে একটি বিরাট মসজিদ স্থাপন করা হয়েছে।

প্রায় এক একর জায়গা জুড়ে সুউচ্চ একাধিক মিনার বিশিষ্ট এ মসজিদ শুক্রবার শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। আহমদীয়া জামাত এ মসজিদ স্থাপনের উদ্যোক্তা। ইসলামের ঐতিহ্যবাহী কর্ডোভা নগরীতে এই মসজিদ উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে প্রায় সাত শত বৎসর পর স্পেনে আবার ইসলামের সগৌরব জয় যাত্রার সূচনা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।" (দৈনিক বাংলা : ১১-৯-৮২ তারিখ)

১৬ই সেপ্টেম্বর '৮২ তারিখে মসজিদ উদ্বোধনের খবর ছবিসহ বাহরাইন, কাতার, দুবাই, আবু ধাবী ও সৌদী আরবের টেলিভিশনেও আরবী ও ইংরেজী নিউজ বুলেটিনে প্রচারিত হয়।

১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮২ তারিখটি আহমদীয়ত তথা ইসলামের ইতিহাসে একটি সোনা ঝরা দিন। আহমদীরা ঐ দিনটিতে বিশেষভাবে দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্র শোকরিয়া আদায় করে এবং ঈদের আনন্দ উপভোগ করে। আমরা ঐ দিনটি ভুলি নাই, ভুলব না।

সম্পাদকীয়

ভুলি নাই ভুলব না

গত ৭-৮-৯৭ তারিখের দৈনিক সংগ্রামে জনাব আ, ন, ম, রশীদ আহমদ কর্তৃক লিখিত "স্পেনের জিব্রাল্টারে আগামীকাল আবার শোনা যাবে আযানের ধ্বনি" শীর্ষক একটি ফিচারের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। ঐদিন দৈনিক ইনকিলাবেও অনুরূপ একটি ফিচার ছাপা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে—

".....আগামী ৮ই আগষ্ট শুক্রবারের একটি যুগান্তকারী ঘটনা। এদিন স্পেনে হারানো ইসলামী সভ্যতার শিখা নতুন করে জ্বলে উঠবে। নতুন করে চিরন্তন সত্যের আওয়াজ ধ্বনিত হবে। নতুন করে তাওহীদ ও রিসালতের ঘোষণা ছড়িয়ে পড়বে জিব্রাল্টারে নব প্রতিষ্ঠিত খাদেমুল হারামাইন জামে মসজিদের মিনারায় দাঁড়িয়ে মক্কা শরীফের মসজিদে হারামের সম্মানিত মুয়াজ্জিনের আযানের মধ্য দিয়ে। ....দীর্ঘ আট শতাব্দীর গৌরবময় মুসলিম শাসনের শোচনীয় অবসান ঘটার পর আল্লাহ্‌র দুশমনেরা বন্ধ করে দিলো তার ঘরগুলো। স্পেনের আকাশে বন্ধ হয়ে গেল আযানের ধ্বনি। ... ..."

নিঃসন্দেহে উপরোক্ত সংবাদটি প্রত্যেক মুসলিম হৃদয়ে আনন্দের ঢেউ বয়ে দিয়ে যাবে। এতে আমরাও খুবই আনন্দিত। কিন্তু আমাদের ঐ বন্ধুকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, স্পেনের আকাশে শুধু কালই নয় বরং দীর্ঘ পনর বছর আগ থেকেই স্পেনের আকাশে বাতাসে আহমদীয়া মুসলিম জামাত কর্তৃক নির্মিত মসজিদ থেকে তৌহীদ ও রেসালতের অমোঘ বাণী—আল্লাহু আকবর, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ্‌ প্রভৃতি ধ্বনিত হয়ে আসছে। ঐ মসজিদ—আল্লাহ্‌র ঘরটি হলো 'মসজিদে বাশারত'। ইহা কর্ডোভার পেড্রোয়াবাদের বড় রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত। এ স্থানটি মাদ্রিদ থেকে ৪০০ কিলোমিটার, গ্রানাডা থেকে ১৬৬ কিলোমিটার এবং মালাগা থেকে ১৮৭ কিলোমিটার দূরে। আহমদীয়া জামাতের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা তাহের আহমদ (আইঃ) ১৯৮২ সনের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে এর শুভ উদ্বোধন করেন। ১৯৮০ সনের ৯ই অক্টোবর এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন আহমদীয়া মুসলিম জামাতের তৃতীয় খলীফা হযরত হাফেয

(অবশিষ্টাংশ ৪৬ পৃষ্ঠায় দেখুন)

3rd Issue 15th August, 1997
Fortnightly THE AHMADI রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

MUSLIM
MTv
AHMADIYYA
INTERNATIONAL

MTA AUDIO CHANNELS

* Main	: 6.50 MHz
* English	: 7.02 MHz
* Arabic	: 7.20 MHz
* Bangla	: 7.38 MHz
* French	: 7.56 MHz
* German	: 7.74 MHz
* Indonesian	: 7.92 MHz
* Turkee	: 8.10 MHz

- এমটিএ MTA আন্তর্জাতিক স্যাটালাইট টেলিভিশন সর্বক্ষণ খাঁটি ইসলাম প্রচারে রত একমাত্র টিভি চ্যানেল।
- সারা বিশ্বে এই চ্যানেল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন সামাজিক, শিক্ষামূলক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানাদি প্রচার করে থাকে।
- এমটিএ একমাত্র টিভি নেটওয়ার্ক যাতে মূল অডিও চ্যানেলসহ মোট ৮টি ভাষায় অডিও চ্যানেল বিদ্যমান।
- বর্তমানে এই চ্যানেল দৈনিক এক ঘন্টা বাংলাদেশের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি চার বার বাংলায় বিশ্ব সংবাদ প্রচার করে চলেছে।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইষ্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মে: হা:।

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২
সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272